আগুনের শাখা প্রশাখা

শিশির দাস

আগুনের শাখা প্রশাখা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৭২

প্রচ্ছদ ও নামপত্র : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :

কৃষ্ণগোপাল মল্লিক

অধুনা

১৭/১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

শেকল

গঙ্গার ধারে গিয়ে নিরিবিলি জায়গা বেছে দুজনে বসলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে সুগত বলল, তুমি রুশোর ঐ কথাটা মানো, স্বাধীন হয়ে আমরা জন্মাই, কিন্তু আমাদের সর্বত্র শৃঙ্খল ?

—না, আমাদের জন্মেও স্বাধীনতা নেই। রুগ্ন মা-বাবার সন্তান আর স্বাস্থ্যবান মা-বাবার সন্তানে তফাৎ আছে। অতএব জন্মে কোনো স্বাধীনতাই নেই।

সুগতর পরণে প্যাণ্ট হাওয়াই সার্ট, সুগঠিত সুন্দর চেহারা, মাথায় বকের পালকের মতো ঘন অবিন্যস্ত চুল। ও আবার বলল, ক্রীতদাস প্রথা পৃথিবী থেকে চলে গেছে বলে, কিন্তু আমি এখন তা বিশ্বাস করি না।

বললাম, ঠিক আছে, মোটামুটি ভূমিকা তো হল, এবার ব্যাপারটা কি বল্।

ও বলতে লাগল, তুই বোধহয় জানিস না, আমি মাস চারেক হল একটা সোশাল সার্ভিসের ট্রেনিং নিচ্ছি। শালা এম এ বি.টি. পাশ করে বসে আছি, আজ পর্যন্ত একটা চাকরি জুটল না। এই আন্তর্জাতিক সমাজসেবক সংস্থা আশ্বাস দিয়েছে, ট্রেনিংয়ের পর চাকরি দেবে।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল, প্রথম থেকে বলি শোন্। আসল ব্যাপারটাই বলব শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে। আমরা জনা-ত্রিশ ছেলেমেয়ে যেদিন প্রথম এই ট্রেনিংয়ে যোগ দিলাম সেদিন থেকে দিন-পনের খালি বক্তৃতা শুনতে হল, যাকে বলে থিয়োরিটিক্যাল ক্লাস। মাইরি, মানুষ এত ভান ভড়ং কায়দা অভিনয় যাকে বলে বক্তৃতা পছন্দ করে, তুই ভাবতে পারবি না।

আমার বস্ দুজন। একজন এক অসামান্যা মহিলা, কোটিপতির মেয়ে আর লাখপতির বৌ হয়েও সমাজসেবিকা বলে কমদামী শাড়ি ব্লাউজ পরেন। কিন্তু তুখোড় ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারেন, বার দশেক ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। বয়েস সাতাশ-আটাশ হবে, শ্যামবর্ণা, যাকে বলে অনুপমা। তাঁকে দেখে মনে হয় রাজরানী যেন গরিবিপনার অভিনয় করছেন, সুসজ্জিত বেশেও দেখেছি অংশু, ওঁর বাড়িতে, সিংহবাহিনীর মতো পাশে

এ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে রাজেন্দ্রাণী। এঁকে আমরা মিসেস ব্যানার্জি বলি। আর পরবর্তী বস্ মিস্টার মজুমদার, রাসভারি সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক।

যাকৃগে, দিন পনের ধরে বক্তৃতাপর্ব শেষ হবার পর একদিন মিসেস ব্যানার্জি এই সংস্থার স্কীমের লিস্ট লেখা বোর্ডটা দেখিয়ে বললেন, এই বোর্ড দেখে ঠিক করুন কে কি কাজ করতে চান।

সেই লিস্টের মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল বেশ্যাদের পুনর্বাসন। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেষ্টিং মনে হল।

আমি বললাম, আমি এইটে নোব।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিসেস ব্যানার্জি, মিস্টার মজুমদার এবং মিস সরকার বলে আর একজন জুনিয়ার অফিসার। তিনজনের কপাল কুঁচকে গেল। মিসেস ব্যানার্জি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে।

আমাদের বলা হল প্রতিদিনের কাজের রিপোর্ট লিখতে হবে এবং অফিসে জমা দিতে হবে।

তারপর একদিন মিসেস ব্যানার্জি আমাকে এবং আমার আরও পাঁচজন কলিগকে ওঁর জিপে তুলে নিলেন। এই পাঁচজন কলিগের মধ্যে দুজন মেয়ে।

উত্তর কলকাতার একটা বস্তিতে গিয়ে একটা চা-পান-বিড়ির দোকানের সামনে জিপ থামল। দোকানের মালিক চেকলুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা একটা গুণ্ডা মতো লোক রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আমরাও সবাই জিপ থেকে নামলাম।

মিসেস ব্যানার্জি তাকে বললেন, গোলাম, এইসব আমাদের ছেলেমেয়ে, ওরা তোমাদের এখানে এবার কাজ করতে আসবে, সাহায্য-টাহায্য করবে, ওদের চিনে রাখো।

গোলাম সেলাম জানাল, আমরাও সেলাম করলাম।

তারপর ফের জিপে ওঠা হল। এবার জিপ গিয়ে দাঁড়াল বস্তির শেষে একটা একতলা বাড়ির সামনে। জিপে বারকয়েক হর্ন বাজাতে প্যান্ট-জামা-পরা মাঝারি বয়সের এক যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

মিসেসের সঙ্গে আমরা জিপ থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সেলাম বিনিময় হল।

মিসেস বললেন, আনিউল ভাই, এই ব্যাচে এইসব ছেলেমেয়েরা তোমাদের এখানে কাজকর্ম করতে আসবে, দেখো কিন্তু।

আনিউল বলল, কোনো অসুবিধা হবে না দিদি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর জিপ ফিরিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকে বস্তির এক এক জায়গায় আমাদের এক এক জনকে নামিয়ে দিয়ে মিসেস ব্যানার্জি অফিসে ফিরে গেলেন.

আমাকে গোলামের চায়ের দোকানের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল। এমনি করে এক একটা দলকে এক একটা আলাদা বস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বস্তি নিয়েই আমাদের কাজ।

জিপ চলে যেতে নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল। যতদূর চোখ যায় বিরাট এলাকা জুড়ে টালি আর খাপরার নিচু নিচু লম্বা লম্বা ব্যারাক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলে গেছে। চারদিকেই কেমন একটা নোংরা কদর্য পরিবেশ। পায়জামা, চেকলুঙ্গি, সার্ট বা গেঞ্জি মানুষদের পোশাক। বোরখা হেঁটে গেল দু একটা। যেয়ো কুকুর ঘুরছে। জঞ্জাল ডাঁই করা আছে, তার থেকে গন্ধ ছাড়ছে, কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধ নাকে আসে। তখন মে মাস। গরমে চারদিক ধূলিধূসর নোংরা বীভৎস দেখাচ্ছে। আমার প্রথমেই মনে হল, নিষ্ঠুর দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা এখানে ডুগডুগি বাজিয়ে মানুষগুলোকে নিয়ে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছে।

আমাদের শেখানো হয়েছিল, যে কোনো বাড়িতে নক্ করে কথা শুরু করবে, আমিও তা পারতাম, কিন্তু গোলামকে সামনে পেলাম বলে ওর দোকানেই ঢুকে পড়লাম।

গোলাম বলল, আসুন বাবু আসুন।

ওদের উচ্চারণ অদ্ভুত, সব 'শ'ই ওদের দন্ত্য স, উচ্চারণে বিশ্রী একটা হিন্দুস্থানী চোয়াড়ে টান আছে।

আমি একটা বেঞ্চিতে বসলাম। ওদিকের বেঞ্চে দুটো ছোকরা নিচু গলায় কি নিয়ে যেন ঠারে-ঠোরে উত্তেজিত আলোচনা করছে। সামান্য যেটুকু কানে এল তাতে 'জাহাজ' শব্দটা শুনলাম, মনে হল, 'স্মাগলিং' ব্যাপারে কথা হচ্ছে। পরে ভালো করে জেনেছিলাম, কলকাতার এইসব বস্তি স্মাগলিং ডেন, ভয়ঙ্কর জায়গা। কোনো নতুন লোক বস্তিতে ঢুকলেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে।

গোলাম শুধলো, চা খাবেন?

—হ্যাঁ

ও চা করে আমাকে দিল। আমি গোলামকে দেখছিলাম। সামান্য ভুঁড়ি থাকলেও ষাঁড়ের মতো চেহারা। পানের ছোপওয়ালা লালচে দাঁত। ছোটো করে ছাঁটা চুল।

মনে মনে একটু ইতস্তত করে আমি 'তুমি' বলেই কথা শুরু করলাম, আচ্ছা গোলাম, তোমাদের এই বস্তিতে কি কি অসুবিধা আছে?

মনে হল গোলাম এসব মামুলি প্রশ্নে সিজনড্ হয়ে আছে, গড়গড়িয়ে বলে গেল, কাঁচা ড্রেন, খাটা পায়খানা, পায়খানাও খুব কম, জলের অভাব, ইস্কুল নেই, আর সবাই বেকার বাবু, কাজ চাই, চাকরি।

আমি বললাম, তা গভর্ণমেণ্ট তো আজকাল বস্তির উন্নতির খুব চেষ্টা করছেন।

—লেকিন, গভরমেণ্ট রুজিরোজগারের কি ব্যবস্থা করছে বাবু, চাকরি হলেই তো আর দুঃখ থাকে না।

আমি শুধোলাম, এখানে শতকরা কতজন বেকার?

—তা বাবু শয়ে ষাটজন হবে।

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশ্যাদের পুনর্বাসন এবং সেই প্রসঙ্গেই আমি যেতে চাইছি। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা এ বস্তিতে মেয়েরা রুজিরোজগার করে?

—হ্যাঁ, কিছু মেয়ে কারখানায় খাটে, কিছু মেয়ে বাসন ফিরি করে, কয়লা কুড়োয়, ঘুঁটে দেয় এই সব করে।

—শতকরা কতজন মেয়ে বেকার?

—হ্যাঁ তা শয়ে সত্তরজন।

—তাদের তো স্বামী ছেলে আছে, তারাই দেখে নাকি?

—সে আছে কিছু, অনেকেরই মরদ নেই।

—তারপর চলে কেমন করে?

এবার গোলাম খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকল, তারপর বলল, তারা বেশ্যা হয়ে বাঁচে।

—এই বস্তিতে!

—হ্যাঁ বাবু!

একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনাকে দিদি দিয়ে গেল, তাই বলছি।

আমি বললাম, শোনো গোলাম, তুমি ওদের সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করতে পার না?

গোলাম অনেকক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, বলুন না, আপনি কি জানতে চান?

—দেখো গোলাম, তোমার কাছ থেকে জানলে ঠিক জানা হবে না। আমরা বস্তির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ শুনতে চাই। তুমি অবশ্য লীডার লোক, সবই জানো, তবু সকলেরই তো নিজের নিজের দুঃখ থাকতে পারে?

গোলাম সেই ছোকরা দুটিকে বলল, কি রে ছালিয়া, লাল, বাবু কি বলছে শুনছিস, তা তোদের জানাশোনার মধ্যে ফুলবস্তী তো বেশ খাপসুরত, বলতে কইতে পারে, ওর কাছে বাবুকে নিয়ে যা।

ছালিয়া, লালের বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। শক্ত লোহার মতো চেহারা। মাথায় চবচবে তেল-ভেজা চুল পাট করে আঁচড়ানো। মুখ চোয়াড়ে, বিশ্রী পানের রসে রাঙানো ঠোঁট, লালরঙের কালো ছোপ-ধরা দাঁত। পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি আর ফুলহাতা সার্ট, পায়ে রবারের জুতো।

লাল বলল, তা মাসীকে তো বলতে হবে।

গোলাম বলল, বলবি।

ছালিয়া হঠাৎ বলে বসল, ফুলবস্তীর এক পেয়ারের লোক আছে বাবু। ওর নাম আছে ওসমান। এদের এসব আসনাই ভালো নয়। আমরা সব জানি, কিছু বলি না। ওসমান তো নিয়ে ভাগতে পারবে না, তো যা পারিস কর না।

আমি বললাম, তাহলে তোমরা ব্যবস্থা করতে পারবে?

লাল বলল, কেন পারব না, চলুন, এখন ফুলবস্তী ফাঁকা আছে, এখুনি চলুন।

আমি গোলামকে চায়ের দাম দিয়ে বিদায় নিয়ে লাল-ছালিয়ার সঙ্গে রাস্তায় নামলাম। ওদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললাম।

লাল শুধলো, বাবু কতদূর লিখাপড়া করেছেন?

বললাম, এম-এ পাশ করেছি।

—আরে ব্বাপ

শুধোলাম, তোমরা কতদূর পড়েছ, পড়তে জানো ?

—না বাবু, বস্তির মানুষ আমরা।

ওরা একটা খাপরার চালের লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘরের দরজার কড়া নেড়ে ডাকল, মাসী, মাসী।

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া বেরিয়ে এল। মোটাসোটা চেহারা, পরনে ছাপা শাড়ি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে বয়সের রেখার কাটাকাটি। ঠোঁট পানের রসে রাঙা। বলল, কি ব্যাপার রে ?

—এই বাবুকে ফুলবন্তীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

—বাবু !

—হ্যাঁ, বস্তির ভালোর জন্যে যারা আসে।

তারপর আমাকে বলল, চলেন বাবু।

ছালিয়া সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকল। লাল আমাকে নিয়ে একটা গলি পথ দিয়ে আর একটা গলি পথে ঢুকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

ভিতর থেকে মিষ্টি গলায় সাড়া এল, কে ?

—আমি লাল।

দরজা খুলে গেল, শালোয়ার আর কামিজ-পরা এক মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

লাল বললে, এই বাবু তোর সঙ্গে কথা বলবে।

তারপর আমাকে বলল, কথা বলুন, আমি চলি।

মেয়েটা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

আমি শুধোলাম, ভেতরে যাব ?

মৃদু মিষ্টি গলায় জবাব দিল সে, আসুন।

উচ্চারণে সামান্য হিন্দুস্থানী টান আছে।

আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। মেঝেটা বাঁধানো। মেঝে থেকে ফুট চারেক ইটের দেওয়াল তারপর মুলীবাঁশের দরমা দিয়ে তৈরী ঘর। ওপরে খাপরার চাল। ঘরে একখানা দড়ির চারপায়া। তার ওপরে বিছানা বালিশ। ছোটো ঘর। ঘরের কোণে একটা কুঁজো আর এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দেওয়ালে নানান দেবদেবীর বাঁধানো ছবি টাঙানো। কালীঘাটের কালী, শিব, দুর্গা এইসব আর ল্যাংটো মেয়েমানুষের ছবিওয়ালা গাদা গাদা ক্যালেণ্ডার দেওয়ালময় ঝুলছে।

আমি শুধোলাম, খাটিয়াতে বসব ?

ও বলল, বসুন।

একটু গা ঘিন ঘিন করে উঠল, তবু বসলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল। খাটিয়াতে বসে অবশ্য দেখলাম দরজার কপাটের পাশে একটা মোড়া আছে, আমি আগে দেখি নি।

স্বাভাবিকভাবেই আমি দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। আমার সমস্ত ভিতরটা কাঁপছিল। ঐ গোলাম, আনিউল, লাল, ছালিয়া, মাসী কাউকেই আমার ভালো মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল ওরা সবাই অন্ধকার ভয়ঙ্কর এক জগতের অধিবাসী। নিষ্ঠুর, বীভৎস এবং বিপজ্জনক মানুষ সব। আমার মনে হয়েছিল, ওরা অবলীলাক্রমে ছুরি চালাতে পারে, খুন করতে পারে, ওদের প্রত্যেকের যৌন-ব্যাধি আছে এবং মোষ যেমন কাদায় মাখামাখি করে সুখ পায় ওরা তেমনি কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আমি আর ফুলবন্তী দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। এই পরিবেশ এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমাকে বিহ্বল করে ফেলছিল। আমি বিস্ময় ও ভয় দমন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলাম আমি। তারপর মেয়েটির দিকে তাকালাম। দরজা দিয়ে আলো আসছিল, একটা ছোটো জানলা ছিল ঘরে, তার থেকেও আলো আসছিল। তাছাড়া ঘরের আলো-আঁধারি ভাবটা তখন আমার চোখে সয়ে গেছে। মেয়েটি সুন্দরী। একটু বর্ণনা দোব নাকি ? বলে স্বগত একটু হাসল, বলল, বয়েস কুড়ি বাইশ হবে। ধবধবে ফর্সা রঙ। খুব মিষ্টি গড়নের সুন্দর মুখ, টানা টানা চোখ, সরু ভুরু, লম্বা নাক, সরু সরু ঠোঁট, সুন্দর চিবুক, লম্বা গলা, উদ্ধত বুক, সরু কোমর যাকে বলে ক্ষীণমধ্যা, নীচের দিকটা ভারি, শাঁখের মতো মনে হয়। আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল।

আমি শুধোলাম, তোমার নাম কি ?

—ফুলবন্তী।

খুব মৃদুস্বরে জবাব দিল ও। ওর গলার স্বর খুব মিষ্টি এবং মৃদু।

আমি প্রশ্ন করে চললাম, এই বস্তিতে কতদিন আছ

—দশ বছর।

—তুমি লেখাপড়া জানো ?

—না।

—এখানে তোমার কি অসুবিধা হয় ? জল, বাথরুম, পায়খানা এসব ঠিক মতো আছে ?

—পায়খানা কম, লাইন দিতে হয়।

—কেন, ভোরে উঠে গেলেই পার ?

—আমরা ভোরে উঠতে পারি না।

—কটার সময় ওঠো ?

—এগারোটা বারোটা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

ও চুপ করে থাকল।

শুধোলাম, কেন, অত দেরিতে ওঠো কেন ?

মেয়েটা মুচকি হেসে মুখ ফেরাল।

বললাম, আচ্ছা, তোমার চোখের তলায় কালি কেন ? কোনো অসুখ আছে ? কি অসুখ ?

ও মুখ ফিরিয়ে বলল, বাবু সবই তো জানেন তাহলে কেন এসব শুধোচ্ছেন ? আমাদের সারারাত জাগতে হয়, তাই ভোর থেকে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে হয়।

—অ, তা তোমার রোজগার কেমন হয় ?

—তিনশ' টাকা মতো।

—খরচ ?

—সবই খরচ হয়ে যায়।

—কেন ?

—ঘরভাড়া লাগে, মাসীকে দিতে হয়, ডাক্তারকে দিতে হয়, একটু দুধ মাছ না খেলে চলে না।

—লোক পিছু কত করে নাও ?

—তিন টাকা।

—প্রতেক রাতে ক'জন খদ্দের ?

—চার পাঁচজন।

—একটা লোক যদি অনেকক্ষণ থাকে ?

—প্রত্যেকবারের জন্যে তিন টাকা করে। বেশিক্ষণ থাকলে কনট্রাক্ট করে নিই, তখন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা পাই, তেমন খদ্দের খুব কম আসে।

—ডাক্তারের কাছে যাও কেন ?

—প্রত্যেক হপ্তায় হপ্তায় দেখানো নিয়ম, একজন কম্পাউণ্ডার এসে দেখে-শুনে ইনজেকসন দিয়ে টাকা নিয়ে যায়।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। ও চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ বললাম বসো তুমি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ঐ মোড়াটাতে বসো।

মেয়েটি একবার বাইরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে মোড়াতে বসে আড়চোখে আমাকে দেখতে লাগল। হয়তো ভাবছিল, এতরকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত আমিই না ওর খদ্দের হয়ে যাই।

আমি বললাম, তুমি আমার কাছে মন খুলে কথা বলো, আমি বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এসেছি। তাতে তোমার কিছু উপকার হবে।

আমার উপকার !

বলে ও হাসল। সে হাসি দেখলে বুক কেঁপে ওঠে।

তবু বললাম, ধরো না, তোমার কোনো দাদা ছিল তার সঙ্গেই কথা বলছ।

ও এবার মিষ্টি করে হাসল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দেশ কোথায় ছিল ?

—ছাপড়া

—দেশে অবস্থা কেমন ?

—ভালো ছিল না, বাবা চাষ আবাদ করত।

—এখানে এসে পড়লে কেমন করে ?

একটু চুপ করে থেকে ও বলল, তখন আমার চাচা-চাচী কলকাতায় ছিল। দেশে খরা হল। মা-বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতায় এল। চাচার কাছে কদিন থেকে আমাকে রেখে মা-বাবা দেশে চলে গেল। চাচা খারাপ লোক। চাচীকে চাচাই এ লাইনে নামিয়েছিল। তারপর চাচা একদিন চাচী আর বাচ্চাকে ফেলে অন্য মেয়ে নিয়ে ভাগল। তারপর আমাকেও নামতে হল। এখানে আমার চাচীও থাকে। আমারই মতো। একসঙ্গেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া।

বললাম, ফুলবন্তী তোমার নাকি ভালোবাসার লোক আছে একজন ?

ফুলবন্তী বিস্ময়ের ভান করে বলল, না, না, কে বলল ?

—লাল, ছালিয়া আমাকে বলেছে, তার নাম ওসমান।

ফুলবন্তী মুখে ওড়না চাপা দিয়ে একটু বুঝি হাসল। তারপর ওড়না সরিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি তাকে পেয়ার করি।

—সেও নিশ্চয়ই তোমাকে ভালোবাসে?

ঘাড় নেড়ে কেমন যেন সংশয় এবং সম্মতি জানাল ফুলবন্তী।

আমি দুম্ করে বলে বসলাম, যদি ওসমান তোমাকে বিয়ে করে বৌ করতে চায়?

আমি স্পষ্ট দেখলাম, ফুলবন্তী কেঁপে উঠল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মনে হল, যেন অবিশ্বাস্য উদ্ভট কোনো কথা শুনছে ও। যেন কোনো মহারাজা ওকে রাণী করে নিয়ে যেতে চায়, এমনি কোনো খবর ও পেয়েছে।

ফুলবন্তী বলল, কি বলছেন বাবু! না, না, তা কেমন করে হবে!

—ধরো' যদি আমি ব্যবস্থা করতে পারি?

—না, না, ওর বাড়ির লোক রাজি হবে কেন? ঐ বা রাজি হবে কেন? আমি তো—

আমি বললাম, ফুলবন্তী, অভাবে পড়ে, মহাবিপদে পড়ে পেটের দায়ে তুমি একদিন এ কাজ নিয়েছিলে। কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করবার ইচ্ছা কি তোমার নেই?

ফুলবন্তী চুপ করে রইল।

হঠাৎ আমার এই দেশ ও মানুষ নিয়ে বীভৎস কোনো বেদনা আমাকে কাতর করছিল। এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভাবছিলাম। জীবন কত তুচ্ছ ও অর্থহীন। কিংবা হয়তো জীবন মানেই এই। তবু মানুষের এই ভয়ঙ্কর দুঃসহ দুঃখ তো মিথ্যে নয়। মনে হল, দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দার্শনিক হওয়া যায় না, তার জন্যে পেটে ভাত চাই, নিশ্চিন্ত অবসর দরকার হয়।

বললাম, তোমার ওসমানের সঙ্গে আমি দেখা করব। আর তুমি ভাবো ভেবে দেখো, বিয়ে থা করে ঘর সংসার করবে কিনা। আমি এখন প্রতিদিন এই বস্তিতে আসব, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল্লাম তাহলে।

পরের দিন বেলা দেড়টা নাগাদ গেলাম ফুলবন্তীর ঘরে। দরজা বন্ধ। টোকা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে পা দিয়েই দেখি একটা লোক, লোক বলা ঠিক হল না, একজন যুবক ওর বিছানায় শুয়ে আছে। আমি ঢুকতেই

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। সুন্দর চেহারা ছোকরার। ফর্সা তামাটে রঙ। মাথায় বড় বড় অবিন্যস্ত ঘন চুল, ওপর দিয়ে আঁচড়ানো, টানা টানা ঘন ভুরু, সুন্দর চোখ, লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গড়ন, ঠোঁটের ওপর শৌখিন গোঁফ।

ফুলবন্তী লাজুক হেসে বলল, এই ওসমান।

ওসমান আমাকে সেলাম করল, আমিও সেলাম ফিরিয়ে দিলাম।

ওসমান উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে বলল, বসুন।

আমি খাটিয়াতে বসলাম, বললাম, তুমিও বসো।

ওসমান মোড়াটাতে বসল। ফুলবন্তী দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথমে সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ টানলাম। গম্ভীর রহস্যময় স্তব্ধতা জগাট বেঁধে থাকল।

আচমকা বললাম, ওসমান, তুমি কোথায় থাকো?

—এই বস্তির লাগাও রাস্তার ওপারে একটা বাড়িতে।

—কি করো তুমি?

—আমি? কারখানাতে চাকরি করি, পাকা চাকরি।

—তোমার কে কে আছে?

—বুড়ো বাবা আর একটা বোন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তা ওসমান তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কখন দেখা হবে?

—সন্ধের সময় যদি যান।

ও আমাকে ওর বাসার নির্দেশ দিয়ে দিল।

আমি বললাম, আজ তাহলে চললাম।

ওদের দুজনকে রেখে আমি চলে এলাম।

সন্ধেবেলায় গেলাম ওসমানের কাছে। ওসমান আমারই জন্যে ওর ঘরের সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। যেতেই সাগ্রহে অভ্যর্থনা করল। দুজনে হেঁটে হেঁটে একটা পার্কে গিয়ে ঢুকলাম। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের কুয়াশার মতো আলো আকাশে মাটিতে ছড়িয়ে গেছে। চারদিকের কোলাহল আর হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে সেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা, গাছ ঘাস আর খোলা আকাশ আমার ভালো লাগছিল।

আমরা দুজনে মুখোমুখি বসলাম। খানিক চুপচাপ বসে থেকে বললাম, ওসমান ফুলবন্তীকে তুমি ভালোবাসো?

ওসমান বলল, হ্যাঁ।

—তাহলে ওকে ওখানে ফেলে রেখেছ কেন?

—কি করব? মাসী আর মাসীর মুরুব্বি আনিউল আর মাসীর পোষা দুই গুণ্ডা লাল ছালিয়া ওকে ছাড়বে না।

—ছাড়বে না কেন?

—বাঃ মাসীর ব্যবসা তো ঐ। কেউ কি মূলধন ছাড়তে চায়? ফুলবন্তীরা চলে গেলে মাসীর ব্যবসা-রোজগার তো বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফুলবন্তীর মতো খাপসুরত মেয়ে।

আমি বললাম, যাক্ গে, তুমি কি ফুলবন্তীকে বিয়ে করে ঘর করতে রাজী আছ?

—আলবৎ।

—তাহলে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করি।

—করুন, যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যবস্থা করে দিন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমাদের বিয়েতে খরচ কত হয়?

ওসমান বলল, মসজিদের মৌলভী কিছু টাকা নেয় আর একটু খাওয়া দাওয়া, তা শ-দুয়েক টাকা খরচ হবে।

—কে দেবে?

—কেন আমার বিয়ে, আমি দোব।

আমি তো ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে যেতে লাগলাম। ওসমান, এই বস্তির মূর্খ নিরক্ষর ওসমান, সে এতবড় প্রেমিক যে, বস্তির সস্তা বেশ্যা জেনেও ফুলবন্তীকে ও বিয়ে করতে চায়।

বললাম, আচ্ছা ওসমান, তুমি যে রকম পাত্র, তাতে অনেক ভালো মেয়ে তুমি বিয়ে করতে পার, ওকে কেন বিয়ে করতে চাইছ? তোমার মন কি বলে?

ওসমান রেগে উঠল, কেন? ওর দোষটা কি? ও দেখতে-শুনতে ভালো, ভালো মেয়ে, ও আমাকে ভালোবাসে, ও আমার বৌ হলে আমার ভালো লাগবে।

—কিন্তু তুমি সুন্দরী কুমারী মেয়ে পেতে।

ওসমান খেপে উঠল, কি যে বলছেন আপনি! এসব কথা ছেড়ে দিন। বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা বলুন। আমি যদি ওকে পাই, আমার মনে কোনো দুঃখ থাকবে না।

তারপর থেকে আমি প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলা ফুলবস্তীর কাছে যেতাম। নানান কথাবার্তা হত। ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে রীতিমত বন্ধুত্ব তৈরী হয়ে গেল। ওসমানের সঙ্গেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিয়ের কথা ক্রমশঃ পাকা হতে লাগল।

ফুলবস্তী ওসমান তখন মশগুল হয়ে আছে। ফুলবস্তী ভাবত, আর কি, এই নরকে থেকে হাজার লোকের সঙ্গে আর রাত কাটাতে হবে না। এবার নিজের স্বামী, নিজের ঘর হবে। ভবিষ্যতের নানান ভাবনায় ও রোমাঞ্চিত হয়ে থাকত। কিন্তু তবু ভয়ে কাঁপত। ভাবত, সবই হয়তো মিথ্যে হবে, মাসীকে সে চিনত।

আমি বললাম, কোনো ভয় নেই, তোমরা ঠিক থাকো, কারও সাধ্যি নেই কোন রকম বাধা দিতে পারে।

শেষে দিনস্থির করবার জন্যে একদিন শেষ দুপুরে ফুলবস্তীর ঘরে ওসমান, ফুলবস্তী, আমি, আমার এক মহিলা কলীগ আর মিস সরকার মিলিত হলাম। কথা ঠিক হল, পরের দিন বিয়ে হবে। মিস সরকার সেদিন অফিসের জীপ নিয়ে এসেছিলেন, সেই জীপে করে ওসমানকে নিয়ে মৌলভীর কাছে গেলাম। ফাইনাল কথা হয়ে গেল। ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে আনিউলের কাছে যাওয়া হল। আনিউল তো প্রথমটা গম্ভীর হয়ে সব শুনল, তারপর হেসে ওসমানের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, বাঃ বলিহারি নওজোয়ান, বেশ!

আমার দিকে ফিরে বলল, আমি আগেই সব শুনেছি, এ বস্তির সব খবরই আমার কানে আসে। তা এতো খুব আনন্দের কথা, আমরাও তো এই-ই চাই। দেশে তো এ ব্যবসা আমরা বেআইনী করে দিতেই চেয়েছি।

আমি অনুরোধ করলাম, স্থানীয় নেতা হিসেবে বিয়েতে আপনাকে থাকতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়ই, তা থাকব না!

আনিউলের কাছ থেকে বিদায় নিতে সন্ধে হয়ে গেল। আনিউল আমাদের অনেকক্ষণ দেরী করিয়ে দিল, আমাদের বসিয়ে রেখে বাইরে কার সঙ্গে কথা বলে এল, আমাদের চা না খাইয়ে ছাড়ল না।

ওসমানকে বললাম, একবার আমাদের অফিসে চলো, মিসেস ব্যানার্জি আর মিষ্টার মজুমদার তোমার সঙ্গে একবার কথা বলতে চান।

তা ওসমানকে নিয়ে আমরা জীপে উঠে বসলাম। বস্তির এলাকাটা

পেরিয়ে একটু এসেছি, হঠাৎ দেখলাম সামনে লাল আর ছালিয়া হাত তুলে জীপ থামাতে বলছে। জীপ থামাতে বললাম ড্রাইভারকে।

গাড়ী থামতেই লাল আর ছালিয়া এসে ওসমানকে কলার ধরে হেঁচকা টান মেরে নীচে নামিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড মারতে লাগল।

লাল হঠাৎ আমার বুকের কাছের জামা খামচে ধরে বলল, হেই বাবু, তুইও নেমে আয়।

আমি নেমে গেলাম। আমার জামার কলার মুঠি করে টিপে ধরে বলতে লাগল, ফের যদি কখনো এই বস্তিতে এসেছ তো তোমাকে শালা খুন করে ফেলব, জান নিয়ে লোব। মনে থাকবে?

বলে দাঁতে দাঁত পিষে আমাকে টুঁটি ধরে কটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বেশ্যার বিয়ে দিতে এসেছো। নিজের বোনের বিয়ে দেগো যা, মনে থাকে যেন পেট ফাঁসিয়ে দোব, টুঁটি ছিঁড়ে লোব।

বলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওসমানকে টুঁটি টিপে ধরল, আর যাবি ফুলবস্তীর কাছে? জান নিয়ে লোব শালা!

ওসমানকে দুজনে মিলে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম। স্বভাবতই মহিলা দুজন ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে গাড়িতে বসে ছিলেন। আমি গাড়ীতে উঠতেই ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল।

মিস সরকার বললেন, থানায় চলো।

মিস সরকার ভীত সন্ত্রস্তভাবে থানার ও-সিকে সমস্ত ব্যাপারটা বললেন।

ও-সি গম্ভীর অবিচলিতভাবে বললেন, ডায়রী করে যান।

—আপনি এখন কিছু করবেন না?

—না এখন কিছু করা যাবে না, আপনারা ডায়রী দিয়ে যান, আমি দেখব।

অগত্যা চলে আসতে হল।

তখনই গাড়ী নিয়ে গেলাম আনিউলের কাছে। লাল-ছালিয়ার ব্যাপারটা বললাম। শুনে আনিউল আমার উপরেই রেগে উঠল, আপনারা এসব করতে যান কেন? ড্রেন করছেন, পায়খানা করছেন, দুধ পাঁউরুটি বিলি করছেন, করুন, হঠাৎ বেশ্যার বিয়ে দেবার কি দরকার হল আপনার?

—তাই বলে? আপনি তো ওসমানকে উৎসাহ দিলেন?

—রাখুন রাখুন, এ বস্তিতে আপনি যাতে আর না ঢুকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব।

অগত্যা জীপে উঠে বসলাম।

অফিসে মিসেস ব্যানার্জি, মিস্টার মজুমদার আমাদের জন্যেই বসেছিলেন।

সব শুনে মিসেস ব্যানার্জি চীৎকার করে উঠলেন আপনাকে আমি ট্রেনিং থেকে ছাড়িয়ে দোব। কেন এসব ঝামেলার মধ্যে গেলেন আপনি?

আমি বললাম, কিন্তু আমাদের তো এ সম্পর্কে স্কীম আছে।

—থাকুক, আপনি আর কোনদিন ও বস্তিতে যাবেন না, আপনাকে আমি অন্য বস্তিতে পাঠাব।

এতদূর বলে চুপ করে গেল সুগত।

আমি বললাম, তারপর?

—তারপর আর কি, বেশ্যা বেশ্যাই থেকে গেল।

—আর ফুলবন্তী বা ওসমানের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি?

খেঁকিয়ে উঠল ও, দেখো, আমি অনেক দিন বেকারীর জ্বালা সহ্য করেছি তাই মিসেস ব্যানার্জির কথা অবহেলা করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি চাকরী করতে গেছি, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর হতে যাই নি।

সে

চৈত্রমাসের বিকালবেলায় কলকাতার এক ফুটপাথ ধরে দ্রুত হেঁটে আসছিলাম। আমার জরুরী কাজ ছিল। হঠাৎ মনে হল, পিছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। ফিরে তাকাতেই এক সুন্দরী মহিলার বিস্মিত হাসি হাসি মুখ দেখতে পেলাম। খানিকটা অস্বস্তি আর দ্বিধা নিয়ে তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। আমার মন থেকে হালকা মেঘের মতো একটা ঝাপসা পর্দা সরে গেল। ঝকঝকে আলোয় হৃদয় ভরে উঠল। মনে হল আমার চারদিকে আচমকা যেন উন্মাদ কলরোল শুরু হয়ে গেল। গাছে গাছে পাতায় পাতায় উদ্দাম বাতাসের অপরূপ শব্দ, পাখিদের কাকলি, ঝর্ণার ঝর্ঝর-ধ্বনি আমি যেন শুনতে পেলাম। আমি ওকে চিনতে পেরেছি। ও ঊর্মি।

আরও কাছে যেতে ঊর্মি বলল, ভালো আছ?

—তুমি ভালো?

—কতদিন পরে দেখলাম, কত পালটে গেছ, তবু দেখেই চিনেছি।

ওর সিঁথিতে সিঁদুর, নানান রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়িতে আজও ও সুন্দর। একটু বুঝি বড় দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই কালো চোখের উজ্জ্বলতা এখনও ছায়াময়, এখনও মদির।

কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে পর্দা-ঢাকা কেবিনে গিয়ে বসলাম। মুখোমুখি। দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কথার তেমন দরকার ছিল না। আমাদের নির্জন অনুভূতি কথা দিয়ে ভেঙে দিতে ভয় করছিল।

ও বলল, তোমার বউ, ছেলে মেয়ে ভালো আছে?

—ভালোই আছে। তোমার ছেলেমেয়ে?

—আমার ছেলেমেয়ে হয় নি, নিষ্ফলা।

—দুঃখ পাও?

—না, না, দুঃখ কিসের! দিন কাটে না, আজকাল কেন জানিনা, পুরোনো কথা বড় মনে পড়ে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

আমার মনে পড়ল, কতদিন আগে শিবরাত্রির দিন বিকেলে আমরা

দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বর নৌকাতে যাবার সময় গঙ্গায় ভীষণ জোয়ার ছিল, নৌকা দুলছিল। ও ভয় পেয়ে একবার আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কষ্টিপাথরের সেই আশ্চর্য কালীমূর্তি দর্শন করে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে এসে আমরা বসেছিলাম। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। গঙ্গার উত্তাল ঢেউয়ে স্তিমিত আলো আলো ভাব ছিল। আর বিশাল অন্ধকার আকাশে লক্ষকোটি তারা জ্বলছিল। সেই তারা ভরা আকাশের নীচে ও আমার পাশে ছিল।

শুধোলাম, ঊর্মি, দক্ষিণেশ্বরের শিবরাত্রির সন্ধ্যার সেই আকাশ তোমার মনে পড়ে?

—মনে পড়বে না? তারায় ভরা অন্ধকার আকাশ।

আমি আর ঊর্মি হঠাৎ একদিন শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসেছিলাম। ফিরবার সময় খুব মেঘ করেছিল; গাছপালা, দিগন্ত গভীর নীল দেখাচ্ছিল। কালো মেঘে বিদ্যুতের হিলিবিলি রেখা। ফাঁকা মাঠে একতলা এক সুন্দর ছোট্ট সাদা বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান। রাঙা ফুলে ভরা বোগেনভিলায়া উঠেছে ছাদ ঢেকে। মেঘের গায়ে লাল ফুল আরও রাঙা দেখাচ্ছিল। ঊর্মি বলেছিল, অমনি বাড়ী আমাদের হবে।

সেদিন ফিরে এসে এক রেষ্টুরেন্টের পর্দা-ঢাকা আয়না-বসানো কেবিনে বসে আয়নার দিকে দুজনে তাকিয়ে আমরা চুমো খেয়েছিলাম।

—ঊর্মি, নীল মেঘের গায়ে বোগেনভিলায়া লতা মনে পড়ে?

ঊর্মি ম্লান হেসে বলল, অমনি বাড়ী আমাদের হবার কথা ছিল।

তারপর আমাদের বিশাল পরিবারে গোঁড়ামি ছিল, টাকা ছিল, আভিজাত্য আর রক্ষণশীলতার অহংকার ছিল। সবাই আমাকে বলতে লাগল, 'ও মেয়ে ভালো নয়।' বাড়ীর কর্তা জেঠামশাই খবর সংগ্রহ করলেন, ঊর্মি নাকি ওর বাবার বৈধ সন্তান নয়। আমার মনে শান্তি ছিল না। পরিবারের সমবেত বিরুদ্ধতার সঙ্গে আমি লড়তে পারি নি। তাহলে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হত আমাকে। আমার বিধবা মা ছিলেন। আমি একরোখা জেদী ছিলাম না। আমি ওকে এক সন্ধ্যায় বলেছিলাম, আমার পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

ওর মুখ মড়ার মতো বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

পরে বহু সাধাসাধি করে ওর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে বড় কাতরভাবে

বলেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে দুঃখ দিয়েছি ; আমি তোমাকেই চাই, আমি আর কাউকে চাই না।

ও বলেছিল, আমি তোমাকে বিয়ে করব না, মরে গেলেও না।

ঊর্মি হঠাৎ বলল, কি অদ্ভুত রহস্য দেখো, এত বয়স হল আমার, এখনও কষ্ট হয়, কিছু ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে কষ্ট যেন অসহ্য মনে হয়। মরণ পর্যন্ত কি এমনি চলবে ! কেন এমন হয় !

আমি জানি না, ভালোবাসা কি, কেন এত কষ্ট, এ অদ্ভুত ব্যাপার কেমন করে আমার জীবনে ঘটল। সব কেন আমার কাছে অর্থহীন অকারণ মনে হয়।

ও ডান হাতখানি টেবিলের উপরে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাতের উপরে হাত রাখলাম।

ঊর্মি বলল, এবার যে যেতে হবে।

বললাম, ট্রেনের সেই পাগলের ডুবকি বাজিয়ে গান গাওয়া মনে আছে ?

ঊর্মি মৃদু গলায় গানের মতো করে বলল—

সেদিন আকাশে বুঝি চাঁদ ছিল
বাতাসে ছিল বুঝি উন্মাদনা
সেদিন যে কথা তুমি দিয়েছিলে মোরে
সে কথা কি মনে আছে প্রিয় হে প্রিয় !

আগুনের শাখা প্রশাখা

(১)

ক্লান্ত-চাঁদ-আঁকা নীলিম-আকাশ। শাল আর মহুয়ার ছেঁড়া ছেঁড়া অরণ্য-ছাওয়া বিশাল রুক্ষ প্রান্তর। মাঝখানে পাথুরে টিলায় ঘাস বা গুল্মের সবুজ ছোঁয়া নেই, খসখসে ধূসর রঙে বৃষ্টি ঝড় আর রৌদ্রের অজস্র চুম্বনের দাগ। শাল বা মহুয়ার বনের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে প্রাকৃতিক শিল্পের মতো ঘর বাড়ি, কৃষ্ণচূড়া বা পলাশের ছায়ায় মাটির খড়ো ঘর। এলোমেলো উঁচু নিচু অসংখ্য তালগাছ। পুবদিকে বিশাল দীঘি। বিরাট বাঁধানো ঘাট। টলটলে আয়নার জলে চাঁদের ছায়া, পাড়ের নিম আর শিরীষের আঁকা বাঁকা ছবি।

আশ্রম-সেক্রেটারী স্বামী জ্ঞানানন্দ প্রতিদিনের মতোই আজও একা এই আবছা চাঁদের আলোয় গোটা আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন।

আশ্রমের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে খেলার মাঠ। তারপরে আকাশ পর্যন্ত ধূধূ করছে ধূসর শূন্যতা। এই চৈত্রে ফসল হয়তো কিছু আছে, রাত্রে চোখে পড়ে না। খেলার মাঠের পরে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও আশ্রমকর্মীদের আবাস-গৃহ দোতালা দালান। দালানের সামনে মস্ত মাঠ। মাঠের পশ্চিমদিকে রান্নাঘর, খাবার ঘর। তার পেছনে আশ্রমের গোয়াল। পুবে দীঘি, উত্তরে স্কুলের তিনতলা বিশাল বাড়ি, স্কুলের পশ্চিমদিকে ছেলেদের তিনতলা হোস্টেল। হোস্টেলের পাশে কিছু দূরে শিক্ষকদের কোয়ার্টার্স। স্কুলবাড়ির পরেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুল ফলের বাগান, বাগানের পশ্চিমদিকে পুর্বমুখী ঠাকুরের মন্দির, পূর্বদিকে জ্ঞানানন্দের দক্ষিণদুয়ারী মাটির কুটীর। বাগানের মাঝখানে আশ্রমের ওয়াটার-সাপ্লাইয়ের জলের ট্যাঙ্ক। বাগানের ভিতরে উত্তর প্রান্তে আশ্রমের অফিস। এই বাগান শেষ হলে মেয়েদের হোস্টেল, হোস্টেলের সামনে বিশাল সবুজ মাঠ। মাঠের উত্তরে মেয়েদের

স্কুল, মেয়েদের জুনিয়ার বেসিক-ট্রেনিং কলেজ, তারপর মস্ত আমের বাগান, বাগানের পর আশ্রমের হাসপাতাল, পশ্চিমে মিসট্রেসদের সারি সারি কোয়ার্টার্স। কোয়ার্টার-গুলির সামনে লম্বা পুকুর। পাড়ে পেয়ারা বাগান। ওদিকে আশ্রমের আরও পশ্চিমে স্কুল বোর্ডিংয়ের পরে বিশাল জায়গা জুড়ে আশ্রমের বিরাট লাইব্রেরী, অভিনয়-সভাসমিতির হল, অতিথি-ভবন এবং আশ্রমের একশ বিঘে ধানের জমি। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার বিঘে জমি নিয়ে এ আশ্রমের এলাকা।

জ্ঞানানন্দ আশ্রম-কর্মীদের হোস্টেলের দোতলায় উঠলেন। বারান্দা ধরে ঘরগুলির সামনে দিয়ে হেঁটে চললেন, তারপর একটি ঘরে ঢুকে পড়লেন। নিরাভরণ ঘরটির দুদিকে দুখানা তক্তপোষে সাধারণ বিছানা। মাঝখানে টেবিল-চেয়ার। একদিকে বইয়ের ছোট র‍্যাক, কাপড়ের আনলা। দুজন যুবক তক্তপোষে বসেছিল, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরে নিয়ন জ্বলছে, ধবধবে দেওয়ালে দুধের মতো আলো।

জ্ঞানানন্দকে দেখছিল ওরা। নেড়া মাথায় ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা চুল। পরিষ্কার করে কামানো মুখ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বড় বড় পৃথুল কান। গম্ভীর ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক মুখ। বয়েস পঞ্চাশের ওপরে। কিন্তু শক্ত সমর্থ লৌহদৃঢ় ছ'ফুট লম্বা মানুষ। মধুর মতো গায়ের রঙ। পরণে হাফ-হাতা গেরুয়া পাঞ্জাবী, লুঙ্গির মতো পরা গেরুয়া মোটা কাপড়, পায়ে অ্যামব্যাসাডার স্যু।

জ্ঞানানন্দ সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয়নাথ কাজটা ঠিকমতো হয়েছে তো?

প্রিয়নাথ বিনীত নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ মহারাজ, আর কোনো গণ্ডগোল নেই।

হঠাৎ দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তে জ্ঞানানন্দের কপাল কুঁচকে উঠল। একখানি লাস্যময়ী রমণীর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে।

উনি বললেন, মুকুল, এ ক্যালেণ্ডার কে এনেছে?

মুকুল ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলল, আজ্ঞে, শহরে ষ্টেশনারী দোকানে আশ্রমের জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম, ক্যালেণ্ডারটা দিলে তাই।

জ্ঞানানন্দ বললেন, এরকম ক্যালেণ্ডার আশ্রমে না রাখাই ভালো।

মুকুল ক্যালেণ্ডারটা খুলে নিয়ে ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেলল।

মহারাজ বললেন, ঠিক আছে, বসো তোমরা।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঘুরতে ঘুরতে মেয়েদের হোস্টেলের সামনে সবুজ মাঠে এসে তিনি দাঁড়ালেন। চারদিক থম্ থম্ করছে। তারাভরা অনন্ত আকাশের নীচে এই গম্ভীর স্তব্ধ আশ্রম এখন ধ্যানমগ্ন যেন। বাতাসের অদ্ভুত শব্দ, শূন্যতার গভীর আওয়াজ, ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার বৃষ্টির শব্দের মতো চারদিক থেকে যেন ছুটে আসছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলো কুহকের মতো ছড়িয়ে আছে। কিশোরী-গলার তীব্র মধুর চড়া সুর নিস্তব্ধ আকাশে ঘণ্টার ধ্বনির মতো ছড়িয়ে গেল, কৃষ্ণা! এই কৃষ্ণা!! হোস্টেলে কোনো মেয়ে তার বান্ধবীকে ডাকছে।

মহারাজ ধীর পায়ে শিক্ষিকাদের কোয়ার্টার্সের দিকে আগিয়ে গেলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, কুয়াশার মতো কুহকী জ্যোৎস্নায় কে দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞানানন্দ অনুমান করলেন। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। তারপর একটু দ্রুতপায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—মহারাজ!

—কে শুক্তি? এখানে একা দাঁড়িয়ে?

—আপনাকে দেখতে পেয়ে এখানে এসে দাঁড়ালাম।

মহারাজ কথা বললেন না।

শুক্তি কাঁপা গলায় আবার বলল, কলকাতা থেকে কখন ফিরলেন?

—ফিরেছি, একটু আগে।

—খবর—

—এনেছি, যেও।

—আচ্ছা

বলে সেই নারী জ্যোৎস্না মেখে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মহারাজ গম্ভীর ভাবে আবার হেঁটে চললেন।

আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে ওঁর ঘরের সামনে শান্তিনিকেতনের তালধ্বজের মতো গোলখড়ের চালওয়ালা একটি বাঁধানো চত্বর, সেখানে টেবিল চেয়ার সাজানো আছে। মহারাজ সেই চত্বরে একটি চেয়ারে বসলেন। বাগান থেকে মৌমাছির নরম গুঞ্জন ভেসে আসছে। উদ্দাম বাতাস আসছে ঝড়ের মতো, গাছ-গাছালির শাখাপ্রশাখায় পাতার মর্মরে বাতাসের ঝর্ঝর্ শব্দ উঠছে।

একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে উনি ওঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বাললেন। ছোট ঘর। মেঝে পাকা, মাটির দেওয়াল নিকোনো, ওপরে খড়ের চাল। একদিকে জানলা ঘেঁসে সরু তক্তপোষে গেরুয়া চাদরের বিছানা। একটি ছোট টেবিল। টেবিলে কিছু বই, একটি টাইমপিস ঘড়ি। টেবিলের পাশে একখানা ইজিচেয়ার, একটি সাধারণ চেয়ার। একদিকে একটি লোহার আলমারি, পাশে ছোট আনলা। দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের একখানি সুন্দর ছবি চমৎকার ফ্রেমে বাঁধানো। ঘরের কোণে জলের কুঁজো।

মহারাজ জুতো খুলে বাইরে গিয়ে পা ধুয়ে এলেন। বিছানায় উঠে চোখ বন্ধ করে ধ্যানাসনে বসে রইলেন। কতক্ষণ তিনি নিঃস্তব্ধ পাথরের মুর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিলেন। আচমকা শুনতে পেলেন, মহারাজ ভিতরে আসব।

কণ্ঠস্বর নম্র, মধুর ও শান্ত।

মহারাজ চোখ খুলে তাকালেন, বললেন, এসো।

শুক্তি বাইরে স্যাণ্ডেল রেখে শান্তভাবে ভিতরে এসে দাঁড়াল। মহারাজ শুক্তির দিকে তাকালেন। শুক্তির গাঢ় নীল ঘন চুল পিঠে ছড়ানো। ঈষৎ রুক্ষ সেই চুলের কিছু কিছু কপালে, কানের দুপাশে এসে পড়েছে। মাথার মাঝখানে সাদা সরু সিঁথি তীক্ষ্ণরেখায় দ্বিধাহীন। গাঁদাফুলের মতো ওর রঙ। কাঁচা হলুদ রঙের পরম সুন্দর ওর মুখে শান্তরসের গভীরতা। চাঁদের মতো দ্যুতিময় কপাল। কান-ছোঁয়া দুটি ভুরু পল্লবের মতো। তাদেরই ছায়ায় দুখানি চোখ নীল পালকের স্নিগ্ধতায় করুণ মাধুর্যে টলোমলো, নীল মদের পাত্রে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। দুর্গাপ্রতিমার মতো নাক, যেন নাকছাবি বিহনে মন খারাপ করে আছে। সুকুমার দুটি গাল। অভিমানী ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক সুন্দর চিবুক ঈষৎ তীক্ষ্ণ। দুটি রক্তিম ঠোঁট ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যের ঠোঁটের মতো। লম্বা গলা নিঃশ্বাসের ছন্দে মৃদু বেপথু, তারপর সমুদ্র-ঢেউ। ললিত দুটি হাতের মসৃণ নিটোল কবজিতে দুগাছি মকর-মুখো বালা, মকরের চোখে চুনি খচিত। আঙুলগুলি লীলায়িত, গোল গোল গোলাপী-বর্ণ নখ। ওর গায়ে সাদা ব্লাউজ, পরণে খয়েরি আর সবুজ রঙের অল্প অল্প কাজ করা ধবধবে বকের পালকের মতো কোমল শুভ্র টাঙ্গাইল শাড়ি, পাড়ে সোনালী মুগার নক্সা। শুক্তির সর্বাঙ্গে শান্ত গভীরতা, কিন্তু প্রলয়ে এই রূপের উদ্দাম ভয়ঙ্করী হয়ে উঠতে বাধাও যেন নেই।

শুক্তি দেখছিল আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানানন্দকে, লোকে যাঁকে বীরেশ মহারাজ বলে জানে। মুণ্ডিত মস্তক, শক্ত বিরাট করোটি যেন কঠিন লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরী করেছে কেউ। শক্ত দৃঢ় বড় বড় কান ঐ মুখের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। রোদ বৃষ্টি ঝড়ে পোড়-খাওয়া টিলার মতো কপালের গড়ন, তিনটি রেখা পড়েছে সেখানে। প্রায় লোমহীন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ গভীর দুটি চোখ টর্চের মতো, ও চোখ বুঝি অন্ধকারকেও বিদীর্ণ করে। মোটা নাকে ব্যক্তিত্বের দম্ভ যেন, শক্ত পুরু পুরু ঠোঁট আর দৃঢ় চিবুকে গম্ভীর ভয়ঙ্কর এক দুর্জয় শক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, পুরুষসিংহ বলতে এমনি মানুষই বোঝায় হয়তো। অথচ এই ভয়ঙ্কর কাঠিন্যের উপরে এক মোহিনী হাসির বরাভয়ের ইন্দ্রজাল আছে মাখানো। পেশল হাতদুটি যেন অসুরের মতো বীরত্ব ও ক্ষিপ্রতা ধারণ করে রেখেছে, দুরন্ত ঘোড়ার কথা মনে পড়ে। পেটানো ব্যায়ামদৃঢ় স্বাস্থ্য। বার্ধক্য এ শরীরকে আশ্রয় করবার দুঃসাহস দেখাতে ভয় পায় বুঝি। মহাভারতের কোনো বীর নায়ক বুঝি জন্মান্তরে ফিরে এসেছেন।

মহারাজ স্নিগ্ধ হেসে বললেন, চেয়ারে বসো শুক্তি।

শুক্তি বিনীত মর্যাদায় চেয়ারে বসল। মহারাজ চকিতে একবার শুক্তির পায়ের দিকে তাকালেন, কাছিমের পিঠের মতো নিটোল গড়ানো দুটি পা। শিরার চিহ্নমাত্র নেই। আঙুলগুলি পদ্মের পাপড়ির মতো সুঠাম সুষম, গোল গোল নখ আয়নার মতো।

মহারাজ কতক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। দুঃসহ স্তব্ধতা পাথরের মতো শুক্তির প্রাণ যেন চাপা দিয়ে রইল। শুক্তির ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ ঘরের স্তব্ধতায় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মহারাজ বললেন, শুক্তি, কলকাতায় আমার অনেক কাজ জমেছিল, তবু এক ফাঁকে তোমার খবর জানতে ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এম.এ.যের রেজাল্ট বেরিয়েছে।

শুক্তি কথা বলল না। দৃষ্টি স্থির রইল।

মহারাজ আবার বললেন, তুমি পাশ করেছ।

শুক্তির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। সামান্য ইতস্তত করে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর মহারাজের কাছে গিয়ে ওঁর পায়ের কাছে মাথা নত করে হাত দিয়ে দুটি পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মহারাজ শুক্তির মাথায় হাত রাখলেন।

শুক্তির মনে হল যেন বামন অবতার যেমন করে বলিরাজের মাথায় তাঁর স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী বিশাল চরণ স্থাপন করেছিলেন, মহারাজের বিশাল হাতের পাতা তেমনি করে যেন তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে। এবং সে হাত ভিতরের কোন নিগূঢ় আবেগে থর থর করে কাঁপছিল।

শুক্তির মনে হল, মহারাজ যেন অনেকক্ষণ পরে হাত তুললেন, শুক্তির চোখে জল এসেছিল। শুক্তি মুখ তুলে দাঁড়াতে মহারাজ তর্জনী দিয়ে শুক্তির চিবুক স্পর্শ করলেন।

মহারাজ জাগ্রত আগ্নেয়গিরির মতো ভিতরে ভিতরে কাঁপছিলেন, শুক্তি তাঁর পাদুটি যেখানে ছুঁয়েছিল যেন সেখানে আগুনের ছেঁকা লেগেছে এবং তাঁর ডান হাতের তর্জনীর অগ্রভাগ যেন পুড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সংযত স্বাভাবিক করবার যন্ত্রণাদায়ক নিষ্ঠুর চেষ্টায় তিনি অসহায় হিংস্র হয়ে উঠছিলেন।

এই আবেগের উত্তাপ শুক্তির মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। তবু নিজেকে স্থির ও সংযত রেখে শুক্তি বলল, মহারাজ, আপনাকে আমি কেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা জানি না, আমার অনেক ভাগ্যে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় পেয়েছিলাম তাই আমি বেঁচে গেলাম।

মহারাজ বললেন, কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নেই শুক্তি, আমি সন্ন্যাসী, এই তো আমার কাজ। যার যা কাজ তা করলে তো আর কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন ওঠে না।

শুক্তি বলল, মহারাজ, আপনার স্নেহকরুণাও তো আমার জীবনের ঐশ্বর্য।

মহারাজ কথা না বলে শুক্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। শুক্তি ভিতরে ভিতরে গাছের পাতার মতো কেঁপে উঠল। মহারাজের দৃষ্টিকে সিংহের দৃষ্টি বলে মনে হল ওর। যেন মহারাজ ওর বুকের ভিতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অনেকক্ষণ পর মহারাজ বললেন, শুক্তি আমি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছি। সন্ন্যাসীর যা করণীয় অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তি তার থেকে আমি কখনও ভ্রষ্ট হই নি, তুমি বিশ্বাস কর এই গেরুয়া কাপড়ের কখনো অমর্যাদা করি নি। সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কখনো ব্রহ্মচর্যম্ নষ্ট করি
মৃগা
ভস্ম আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী যতটা পেরেছি

মানুষের সেবা করতেও ত্রুটি করি নি। আমি নিজেকে তন্ন তন্ন করে প্রশ্ন করেছি, বিবেকের কাছে কখনো আমাকে নতজানু হতে হয়নি। কিন্তু—

বলে অনেকক্ষণ সন্ন্যাসী নির্বাক হয়ে রইলেন। এই নীরবতা শুক্তির কাছে কষ্টকর হয়ে উঠছিল। সন্ন্যাসী আবার নীরবতা বিদীর্ণ করে আর্তস্বরে বললেন, কিন্তু আজ কিছুদিন হল আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। আজকাল সারাদিন পরিশ্রম করেও রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি না। কত রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বাগানে পায়চারি করে কাটাই, মন্দিরে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হত্যা দিই। তবু অশান্ত আত্মাকে আমি শান্ত করতে পারছি না। নানান অদ্ভুত প্রশ্ন, উৎকট জিজ্ঞাসা আমার শান্তি ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে।

শুক্তি শুধোল, কেন মহারাজ!

শুক্তির স্বর্ণঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বরে বেদনার কাতরতা ছিল।

মহারাজ বললেন, বহুপ্রশ্ন আমাকে দিনরাত ক্ষতবিক্ষত করছে শুক্তি। এখানে যা করার ছিল আমি বা আমরা তা করেছি। তার জন্যে আমাকে পঁয়ত্রিশটি বছর অসুরের মতো খাটতে হয়েছে। এই শুকনো কাঁকুরে ডাঙ্গায় আমি ফুল ফুটিয়েছি। সব করেছি, একটা কলেজ করতে বাকী আছে, তারও সব আয়োজন সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। এখন একজন অন্ধও তা শেষ করতে পারে। কিন্তু—

বলে একটুখানি চুপ করে থেকে মহারাজ আবার বললেন, কিন্তু তাতে কিই বা হল! আমার এই দেশে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে বাঁচে, কোটি কোটি মানুষ দিনের পর দিন ভাতের মুখ দেখে না, এমন কত মানুষ আছে যাদের অন্ন নেই, অক্ষর-পরিচয় নেই, পানীয় জল নেই, রোগে ওষুধ নেই। আমার, আমাদের এ কাজ সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য, কাঠবেড়ালির সেতুবন্ধন। এর কোনো মূল্য নেই, এ নিজেকে চোখঠারা ছাড়া কিছু নয়।

—কি বলছেন মহারাজ!

—আমার এসব কথা তুমি হঠাৎ বুঝবে না শুক্তি। কিন্তু আমার এই বীভৎস অস্থিরতার জন্যে আর একজনও দায়ী।

শুক্তি কেঁপে উঠে ভাঙ্গা গলায় বলল, কে মহারাজ!

—তুমি শুক্তি!

—আমি!

—হ্যাঁ, মেয়েদের দিকে মনোযোগ দেবার দরকার কখনো আমি অনুভব

করি নি। কিন্তু তুমি যেদিন প্রথম আশ্রমে এলে সেদিনের কথা তোমার মনে আছে ?!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা কেমন করে ভুলব !

—বলো তো শুক্তি, কি তোমার মনে আছে ?

—সে সব কথা আপনি তো সবই জানেন মহারাজ !

—তবু বলো, কারও একার কথা তো আমি মনে রাখতে চাই নি।

—মহারাজ, আমার মা বিধবা হয়ে এক ব্যারিস্টার ভদ্রলোকের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নিয়ে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। আমার বাবা গরীব মানুষ, সামান্য কেরানী ছিলেন। বাবার অকালমৃত্যু হলে মা ঝি-বৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। আমার দুবছর বি.এ. পড়ার পর মা মারা গেল। সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক ভবনাথবাবু আপনার শিষ্য ছিলেন, তিনি আমাকে নিয়ে এসে আপনার চরণে সঁপে দিলেন। তারপর আপনি আমাকে বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ালেন, পাশ করলে বেসিক-ট্রেনিং পাশ করিয়ে আনলেন, এখানকার বেসিক-ট্রেনিং কলেজে প্রিন্সিপ্যাল করে দিলেন। তারপর এম.এ.ও পড়ালেন।

—কিন্তু তোমাকে বেসিক-ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কেন করলাম জানো ?

—না, আমি তা জানি না।

—সাধারণ মিস্ট্রেস হলে আমার কাছে তোমার আসা-যাওয়ার দরকার হত না, প্রিন্সিপ্যাল হলে নানান কাজের অছিলায় তোমাকে কাছে ডাকতে পারব বলেই তোমাকে প্রিন্সিপ্যাল করেছি।

—তা আমি জানি।

—হ্যাঁ, আর এও জানো এই রাত্রিবেলা সন্ন্যাসীর নিরিবিলি ঘরে তুমি সুন্দরী মেয়ে যে দাঁড়িয়ে আছ তারও কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় বলেই তোমাকে কতদিন আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।

শুক্তি চুপ করে রইল। ওর প্রাণের গভীরে তখন ঝড়ের গর্জন জেগেছে, ভিতরে ঝঞ্ঝার উত্তাল বেগ বিক্ষুব্ধ ভীষণ হয়ে মাতামাতি লাগিয়েছে।

মহারাজ আবার বললেন, যেদিন তুমি সেই ভবনাথের সঙ্গে এসে বাইরে ঐ চত্বরে আমার সামনে দাঁড়ালে আমি আপাদমস্তক কেঁপে উঠলাম, মনে হল তুমি যেন আমার কত পরিচিত, যেন কতদিন তোমার সঙ্গে আমার নিবিড়

পরিচয় ছিল তারপর বহুদিন দেখাশোনা নেই। আমার মনে হল, যেন মা-কালীর সামনে হাড়িকাঠে আমার মাথাটা কেউ ঢুকিয়ে দিল আর মা যেন নিজের হাতের সেই রক্তমাখা খাঁড়া তুলে আমাকে বলি দিতে উদ্যত হলেন। তোমার কিছু মনে হয় নি শুক্তি ?

শুক্তি বলল, আমার ? আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন কোনো গভীর বনে এক সিংহের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ভয়ে আমি কেঁপে উঠেছিলাম মহারাজ !

—আজও কি ভয় পাও শুক্তি ?

—ভয় পাই, তবে ভক্তিও করি, আপনার কাছে আমার আসতে ভালো লাগে।

—আর তুমি আমার কাছে এলে আমার চারপাশে আকাশ বাতাস, গাছপালা, লতাপাতা, মাটি থেকে গ্রহতারা পর্যন্ত সব কিছু মধুময় হয়ে ওঠে। তুমি আশ্রমে আছ বলে আমি সান্ত্বনা পাই, সব কাজে সব দায়িত্ব-পালনে আমার আনন্দ উদ্বেল হয়ে ওঠে। তুমি এ আশ্রমে না থাকলে আমার কাছে সব কিছুই অর্থহীন নীরস শুকনো বলে মনে হত শুক্তি !

গাঢ় নিঃশ্বাস নিয়ে শুক্তি বলল, মহারাজ, আপনি সন্ন্যাসী, তবু আজ বলি, আপনি ছাড়া তো আমার সত্যিকার আপনজনও কেউ নেই।

এবং জ্ঞানানন্দ গম্ভীর আর্ত চাপা স্বরে বলে উঠলেন যেন মহাকালের কোনো অমোঘ বাণী বেজে উঠল, শুক্তি, আমি আর সন্ন্যাসী থাকতে চাইনা। আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি, এ সন্ন্যাসের কারাগারে নিজেকে বন্দী করে রেখে আমি আমার সঙ্গে আজকাল প্রতিনিয়ত ছলনা করছি। এ ছলনাকে আর অমি প্রশ্রয় দোব না। আমি মুক্তি চাই, এ ভড়ং, এ ছদ্মবেশ আমি এবার ছেড়ে ফেলব।

ভয়ে কেঁদে ফেলল শুক্তি, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বলল, মহারাজ, আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে।

সন্ন্যাসী বললেন, আমার বাকী জীবনে তুমি কি আমার কাছে থাকবে শুক্তি ?

শুক্তি কথা বলল না, বিবর্ণ ভীত মুখে পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল।

আর স্বামী জ্ঞানানন্দ অকস্মাৎ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন, তারপর দুবাহুতে শুক্তিকে তাঁর বিশাল বুকের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন, শুক্তির

অশ্রুভেজা মুখে মুখ নত করে ঠোঁটে ঠোঁট স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন কেউ তাঁকে জ্বলন্ত চিতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, মনে হল, নরকের বাতাস সেই আগুনকে লেলিহান করে তুলছে, সহস্র জিহ্বা মেলে সে আগুন তাঁকে লেহন করতে চাইছে, মাথার উপরে বুঝি লক্ষ লক্ষ শকুনির পাল আকাশ অন্ধকার করে নেমে আসছে, লাখো লাখো গলিত কুষ্ঠরোগী তাঁর চিতাগ্নির চারপাশে কুৎসিত নাচে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তিনি হু হু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, শুক্তি তুমি যাও, এখন যাও তুমি।

শুক্তি টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(২)

সারারাত্রি ঘুমোতে পারলেন না বীরেশ মহারাজ। নিজেকে তিনি নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় বারংবার নানা ভাবে বিচার করলেন। মনে মনে তিনি বলতে লাগলেন, আমি অগ্নিসাক্ষী করে গুরুর কাছে যে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলাম, গোপনে ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মতো তাকে আমি কলঙ্কিত করলাম। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম তো আমি আগেই মনে মনে ত্যাগ করেছি। আমার যুক্তিবোধ আর বিবেকের সামনে মাথা হেঁট করে আমাকে কতবার দাঁড়াতে হয়েছে। আমাকে মেনে নিতে হয়েছে, আমি কপটাচারী। সন্ন্যাসীর গেরুয়া বর্ম পরে আমি সন্ন্যাসধর্মকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করেছি।

এই সব কথা অন্ধকার একাকী ঘরে তিনি মনে মনে বলে চললেন আর তাঁর সামনে শুক্তি যেন ছায়ামূর্তি ধরে অকম্পিত নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। যেন শুক্তির সামনেই তাঁর এইসব জবাবদিহি করার প্রয়োজন ছিল, তাঁর বিবেকই যেন শুক্তির মূর্তি ধরে তাঁর নয়ন-সম্মুখে জাগ্রত হয়ে রইল। এমনি করে সারারাত্রিব্যাপী তাঁর যুক্তি-বিচার-বিবেক-বোধ, তাঁর অতীত জীবনের অসংখ্য স্মৃতি, তাঁর জীবনদর্শন এবং শুক্তির প্রতি তাঁর সর্বব্যাপী বিপুল প্রেম সমুদ্র-

তরঙ্গের মতো ভয়ঙ্কর আক্রোশে গর্জনে বারংবার তাঁর সর্ব অস্তিত্ব জুড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। তাঁর মনে হতে লাগল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অকূল কোন সমুদ্রে তিনি ভেলা ভাসিয়েছেন আর সে-ভেলা পাল ছিঁড়ে হাবুডুবু খেয়ে বিপর্যস্ত ভগ্নপ্রায়, বুঝি কূলের সন্ধান আর মিলবে না।

নিদ্রাহীন রাত্রি শেষ হল। ভ্রমর-মৌমাছির গুঞ্জর আর ভোরের পাখিদের ডাকাডাকি শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ধোঁয়াটে কুয়াশা আর তরল অন্ধকারে পৃথিবীকে বড় দীনা মনে হল মহারাজের। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো যথারীতি তিনি মুগুর ভাঁজলেন, ডনবৈঠক দিলেন। প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান সেরে এসে ধোয়া জামাকাপড় পরলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে সাজি নিয়ে বাগানে ঢুকলেন ফুল তুলতে। সাজি ভরে ফুল তুলে মন্দিরে রেখে নিজের ঘরে এসে ধ্যানে বসলেন। বেলা আটটা নাগাদ আশ্রমের অফিসে গেলেন। অফিসের কাজকর্ম যা ছিল সারা হয়ে গেলে দর্শনার্থীদের সঙ্গে একে একে দেখা করলেন। সকলের অভাব-অভিযোগ প্রার্থনা পুরণ হতে বেলা দশটা বাজল। অফিস থেকে গেলেন মন্দিরে পুজো সারতে। ঘণ্টাখানেক পরে পুজো সাঙ্গ হলে ঘরে ফিরে ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরে সহস্র শিখায় যেন চিতা জ্বলছে, তাঁর মৃত সন্ন্যাসের লেলিহান চিতা। গত রাত্রি থেকেই লক্লকে আগুন যেন জ্বলছেই জ্বলছে। এ আগুন যেন এ জীবনে আর নিভবে না. কে জানে মৃত্যুর পরেও হয়তো অনির্বাণ থাকবে এই ভয়ঙ্কর পবিত্র আগুন।

খাবার ঘণ্টা পড়ল আশ্রমে। মহারাজ চেয়ার ছেড়ে খাবার ঘরের দিকে হেঁটে চললেন, পথে অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদেরও ডাকলেন। সকলে খাবার ঘরে নিজের নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলেন। তারপর প্রতিদিনের মতোই খেতে খেতে নানান হাসি-ঠাট্টা চলতে লাগল। আশ্রমের পুরোনো দিনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আর দুঃখের ঘটনাও এ সময়ে হাসির ব্যাপার বলে ভাবতে ভালো লাগে। আশ্রমের সকলেই গম্ভীর বীরেশ মহারাজকে এই সময়েই বড় আপন করে পায়, শিশুর মতো মনে হয় ওঁকে।

সমবয়সী সন্ন্যাসী হোমানন্দ আচমকা বললেন, বীরেশ, তোমার শরীর কি ভালো নেই ?

মহারাজ রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট রক্তাক্ত চোখ তুলে হোমানন্দের দিকে

তাকালেন, তারপর বললেন, হোম, শরীর ভালো আছে, মন ভালো নেই। দেখো, তোমরা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলে সে-দায়িত্ব আমি শেষ করে ফেলেছি, এবার আমি বাহুল্য, আমার শেষ বিদায় কামনা কর তোমরা।

সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ গম্ভীর হয়ে উঠল।

হোমানন্দ কোনো কথা না বলে মহারাজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

মহারাজ আবার বললেন, তারপর আমাকে দুটো খেতে পরতে দিও, সন্ন্যাসীর বার্ধক্য বড় ভয়ঙ্কর।

হোমানন্দ বললেন, অমন করে কথা কেন বলছ বীরেশ? এই সব কথা শুনলে আমাদের সকলেরই বড় দুঃখ জাগে। তুমি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, আমরা সকলেই তোমাকে কত ভালোবাসি তা কি তুমি জানো না!

মহারাজ বললেন, জানি মহারাজ, আর জানি বলেই তো আমার বুকের ভিতরে দিনরাত্রি আগুন জ্বলছে, কেমন করে এ আগুন শান্ত হবে হোমানন্দ!

খাওয়া শেষ হলে বীরেশ মহারাজ, হোমানন্দ, আর একজন সন্ন্যাসী নির্মলানন্দ বীরেশ মহারাজের ঘরের সামনে সেই গোলাকার চালার নীচে গিয়ে বসলেন। একটু পরে শুক্তিও এল। সেই শান্ত পবিত্র মুখশ্রী, ঈষৎ রুক্ষ বিশাল চুলের রাশি, ধবধবে সাদা শাড়ি; যেন ওর সর্ব অঙ্গে পবিত্র দেবীভাব। যেন এখনই ও পুজার আসন থেকে উঠে এল।

মহারাজ বললেন, বসো। যাঁরা ইণ্টারভিউতে এসেছেন তাঁদের চা-টা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বিশ্রাম নেবার কোনো অসুবিধা হয় নি?

শুক্তি বলল, সব ব্যবস্থাই হয়েছে।

—বেশ, তাহলে, ইণ্টারভিউ শুরু করা যাক।

বেসিক-ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপিকা নেওয়া হবে বলে আজ ইণ্টারভিউর কথা ছিল।

ইণ্টারভিউ শেষ হতে বেলা গড়িয়ে গেল। তিনজন সন্ন্যাসী এবং প্রিন্সিপ্যাল শুক্তি সেন আলোচনা করে কাকে নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত করলেন। তারপর শুক্তি উঠে দাঁড়াল। জোড়হাত তুলে সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি যাই মহারাজ।

বীরেশ মহারাজ বললেন, এসো, আর বিকেলে আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরো।

নির্মলানন্দও উঠলেন, বললেন, আমি যাই একটু লাইব্রেরী থেকে ঘুরে আসি।

হোমানন্দ আর মহারাজ নির্বাক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বাগান থেকে পাখিদের কাকলি ভেসে আসছিল ; ঝরা শুকনো পাতার অদ্ভুত করুণ শব্দ, ফুলের সুবাস, গাছপাতার বিচিত্র গন্ধ ওঁদের চারপাশে এক নিবিড় বিষণ্ণতা ঘনিয়ে তুলেছিল।

আচমকা হোমানন্দ বললেন, বীরেশ, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মহারাজ বললেন, হোম, আমিও তোমাকে কিছু বলতে চাই, কেমন করে বলব তাই ভাবছিলাম।

আবার দুজনে চুপ করে গেলেন।

অনেক পরে হোমানন্দ বললেন, বীরেশ, আমি জানি না, যে কথা তোমাকে বলতে চাইছি তা আমার বলা উচিত হবে কিনা।

মহারাজ বললেন, তোমার যা মনে হয় বলো হোম, কেননা তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, সন্ন্যাসীর বন্ধু থাকতে নেই। তবু তুমি ছাড়া নিজেকে আমি ভাবতেও পারি না।

হোমানন্দ বললেন, বীরেশ, পঁয়ত্রিশ বছর আগে তুমি আর আমি ব্রহ্মচারী হয়ে এই আশ্রমে একসঙ্গে এসেছিলাম। তুমি স্বভাবতই নেতা, স্বভাবনেতৃত্ব আছে তোমার চরিত্রে। কিন্তু চিরদিন আমি তোমার ডান হাত হয়ে থেকেছি।

মহারাজ বললেন, তুমিও নেতা, তুমি নীরব প্রেরণা, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই মন্ত্রী। আমিই তোমার ডান হাত। যেমন নাকি চাণক্যের ডানহাত চন্দ্রগুপ্ত।

হোমানন্দ বললেন, থাক, ও কথা থাক। তখন এখানে ধূধূ করত রুক্ষ শুকনো ডাঙ্গা, বনজঙ্গল, তুমি গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করেছ আশ্রমের জন্যে। আমি জানি, তুমি অভিজাত বংশের সন্তান ছিলে, ভিক্ষায় তোমার রুচি ছিল না। কিন্তু সমস্ত পূর্বসংস্কার তুমি জয় করেছিলে। তারপর আশ্রমের কত অভাব-দারিদ্র্য গেছে, দুবেলা অন্ন জোটেনি কতদিন। এই ফাঁকামাঠে এই বনে জঙ্গলে কত দুঃখে দিন কেটেছে তোমার। আশ্রমের ন্যায্য জমি নিয়ে বদমাস শক্তিশালী লোকেদের সঙ্গে মামলা করতে হয়েছে তোমাকে। কিন্তু আমি চিরদিন তোমার সঙ্গেই আছি।

মহারাজ চুপ করে থেকে আশ্রমের অতীত বৎসরগুলি দ্রুত ভেবে দেখলেন।

হোমানন্দ বলতে লাগলেন, তারপর দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ফাঁকা পোড়ো মাঠে তুমি ইন্দ্রপুরী তৈরী করেছ। আজ এখান থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখছে, লোকে রোগে চিকিৎসা পাচ্ছে, দুর্ভিক্ষের সেই বীভৎস বছরে এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের তুমিই বাঁচিয়ে রেখেছিলে।

মহারাজ বললেন, থাক হোম, ওসব কথায় কি কাজ আছে, সন্ন্যাসীর কাজই আমরা করেছি, নতুন কিছু করি নি।

হোমানন্দ বললেন, তবে থাক, প্রশংসা করে তোমাকে বিরক্ত করব না। মনে আছে তোমার সেদিনের কথা, একই দিনে আমাদের দুজনকে গুরু-মহারাজ পবিত্র হোম করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন, এই গেরুয়াবসনে অধিকার দিয়েছিলেন। সেদিন থেকে তোমার নাম হল স্বামী জ্ঞানানন্দ আর আমার নাম স্বামী হোমানন্দ। কিন্তু ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই তুমি এ অঞ্চলে সর্বজনমান্য হয়েছিলে, সন্ন্যাসী হবার পরও তোমার সেই ব্রহ্মচারী সময়কার পরিচিতি বীরেশ মহারাজ নামই লোকমুখে, আশ্রমে টিঁকে রইল। আমাদের পুরনো নাম কিন্তু হারিয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে হোমানন্দ আবার বললেন, তুমি এ অঞ্চলে মহামান্য সন্ন্যাসী। তুমি মহারাজ নাম সার্থক করেছ।

বলে অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন হোমানন্দ। আবার এক শান্ত গম্ভীর স্তব্ধতা পাথরের মতো জমাট বেঁধে রইল।

মহারাজ বললেন, তারপর বলো হোম, দ্বিধা কোরো না।

হোমানন্দ বললেন, আজ অতি সূক্ষ্মভাবে তোমার নামে কলঙ্ক রটছে চারদিকে। জানি না, তোমার কানে এসেছে কিনা, কিন্তু আমি শুনতে পাই।

—কলঙ্ক? সন্ন্যাসীর কলঙ্ক!

—হ্যাঁ বীরেশ, আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু আমাকে বলতেই হবে। কেননা আমরা পরস্পরকে রক্ষা করব দুঃখ থেকে, বেদনা থেকে, কলঙ্ক আর লজ্জা থেকে। শুক্তিকে জড়িয়ে তোমার নামে চাপা কলঙ্ক আশ্রমে এবং আশ্রমের বাইরে লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ছে।

হোমানন্দ একটুখানি নীরব থেকে আবার বললেন, শ্রীচৈতন্যের জীবনের সেই ঘটনা তুমি জানো, এক সুন্দরী যুবতী বিধবার একমাত্র পুত্র একটি ছোটো ছেলে চৈতন্যের কাছে আসত, এই শিশুকে চৈতন্য ভালোবাসতেন। কিন্তু যেদিন তাঁর এক সন্ন্যাসী পার্ষদ জানালেন যে, ছেলেটির মা যুবতী এবং সুন্দরী তারপর দিন থেকে ছেলেটিকে আর তিনি কাছে আসতে দিলেন না।

মহারাজ বললেন, শ্রীচৈতন্যের জীবনের আরও ঘটনা আমার মনে পড়ছে। এই নিষ্ঠাবান কঠোর সন্ন্যাসী ছোট হরিদাসের সন্ন্যাসধর্মের সামান্য বিচ্যুতিও ক্ষমা করেন নি।

হোমানন্দ অনেকক্ষণ আর কোনো কথা বললেন না। জ্ঞানানন্দও নির্বাক হয়ে রইলেন।

তারপর নীরবতা ভেঙ্গে মহারাজ বললেন, হোম, আমি জানিনা, তুমি কেন সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেছিলে, কি সে প্রেরণা যা তোমাকে এ পথে ডাক দিয়েছিল? কিন্তু আমার সন্ন্যাসী হতে চাওয়ার তিনটে স্পষ্ট কারণ ছিল। একটি তোমাকে বলব না, বলা আমার অধর্ম হবে। আর দুটি তোমাকে আজ বলব।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আমি তখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি মানে এখনকার ক্লাস টেন, বয়স পনের ষোল হবে। সেই সময় আমাদের গ্রামের এক গরীব বুড়ো মানুষ অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল। সে বুড়োর আর কেউ ছিল না। গ্রামের ভিতরে একখানা কুঁড়ে ঘর ছিল তার; সম্বলও আর কিছু ছিল না। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, খুব ছোটো স্যাঁতসেঁতে একখানা অন্ধকার ঘর, বুড়ো বোধহয় ভাগাড় থেকে গোরু-মোষের হাড় আর ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে জীবিকা অর্জন করত। তার ঘরে কিছু স্তূপীকৃত হাড় আর ছেঁড়া কাগজের জঞ্জাল ছিল। বিশ্রী নোংরা সেই ঘরে কুৎসিত দুর্গন্ধ, ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এলে দেখলাম, ঘরের একটি মাত্র গবাক্ষে বাঁশের রড, সেই রডে গামছা বেঁধে সেই গামছা গলায় বেঁধে বসে বসে বুড়ো আত্মহত্যা করেছে। ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে চোখ, জিব বেরিয়ে গেছে, কষে রক্তের দাগ। হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার বুড়োর পরণে ছেঁড়া গামছা।

একটুখানি চুপ করে রইলেন মহারাজ, তারপর আবার বললেন, সেই বীভৎস মৃত্যু আমাকে ভীষণ ভাবে আঘাত করল, মনে হল, মানুষ এইভাবে

মরবে আর আমি বড়লোকের ছেলে হয়ে দুধে ভাতে সুখে থাকব, এত বড় অপরাধের ক্ষমা নেই যেন। আমি কতদিন যে তখন ঘুমোতে পারিনি! তারপর বি.এসসি. পড়ার সময় গান্ধীজীর আন্দোলন শুরু হল, আমার মনে হল দেশে স্বরাজ এলে কোটি কোটি মানুষের এই অনাহার, এই দুঃখ, এই বেদনার অবসান হবে। আমি স্বরাজের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জেলে গেলাম। অনেকদিন জেলে কেটেছিল। জেলের মধ্যে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, ভিখিরীদের দেখেছিলাম। অধঃপতিত মানুষের অধঃপতনের কারণও আমার মনে হয়েছিল দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, প্রতিদিনের অপমান। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে বড় নোংরামি হোম, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মানুষকে অমানুষ করে দেয়। একটা ব্যাপারে বড় আঘাত খেয়ে রাজনীতি ছাড়লাম। তারপর মনে হল, সন্ন্যাসীর সেবাধর্ম নোব, মানুষের আত্মার আর দেহের শান্তি যোগাবার এই সঠিক ব্রত। এই ভাবেই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলাম।

আবার কতক্ষণ নীরবতার পর হোমানন্দ বললেন, কিন্তু তারপরে বলো।

—তারপর এই পঁয়ত্রিশ বছর সন্ন্যাস জীবন যাপন করলাম। কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে, এ প্রহসন মাত্র, বৃথা আত্মতুষ্টি।

—কেন? একি কথা!

হোমানন্দ কেঁপে উঠলেন যেন, তাঁর মাথায় রক্তস্রোত বেগে প্রবাহিত হয়ে উঠল, মনে হল, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, তাঁর পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে।

মহারাজ বললেন, হোমানন্দ, আমার এই দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ মানে কোটি কোটি মানুষ অনাহারে বাঁচে, নিরক্ষর হয়ে থাকে, রোগে চিকিৎসা পায় না, বিপদে সহায় পায় না, দুঃখে সান্ত্বনা পায় না। আর আমি আমার সেবাধর্ম সন্ন্যাসধর্ম নিয়ে এই আশ্রম করে আত্মতুষ্টিতে ভুগছি। এখানে কাদের সন্তানরা পড়ে হোমানন্দ, তারা অবস্থাপন্ন কিংবা সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সুস্থ-সবল ছেলে, বড় হয়ে তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ভালো চাকুরে হয়ে প্রচুর পণ নিয়ে বিয়ে করে বিলাস আর আরামের ঘর বাঁধছে, দেশের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য বেদনা নিয়ে মাথা ঘামাবে না তারা। আর যে মেয়েরা পড়ে তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বড় চাকুরে বা ধনী-গৃহের বৌ হবে। তারাও স্বার্থপর বৌ হয়ে ন্যাকামি করবে, পরে মোটা-সোটা গিন্নিবান্নি হয়ে ছেলের বিয়েতে মোটা টাকা আদায় করবে। তোমার হাসপাতালে কটা গরীব লোক চিকিৎসা পায়, তুমি ক'জন ক্ষুধিতকে

অন্ন দিতে পার? এ অঞ্চলে আমি মহামান্য মানুষ বলছিলে, অথচ এই অঞ্চলের দরিদ্র অনাহারী নিরক্ষর মানুষদের জন্যে আমি কিছু করতে পারি নি হোমানন্দ, কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

একটু চুপ করলেন মহারাজ, তারপর আবার বললেন, এভাবে কিছু হয় না হোমানন্দ, হয়তো এরও অনেক মূল্য আছে। কিন্তু এই কি আমি চেয়েছিলাম! তদ্বির করে করে টাকা আনি, তোষামোদ করে মোটা মোটা টাকা ভিক্ষা আনি, সেই টাকায় কাদের উপকার করি? সেই আত্মহত্যার দড়িতে ঝোলা বুড়ো মানুষটির মুখ তো ভুলতে পারি না? এই তো সেদিনও দেখলে, আমাদের আশ্রমের গায়ে যে গ্রাম সেই গ্রামের একটা পরিবারের ছেলেমেয়ে করে সাতজন অনাহারের জ্বালায় ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, আমি কি তাদের বাঁচাতে পেরেছি হোম! ভিক্ষা করে আমাদের পেট চলে, অন্যের অন্ন কেমন করে জোটাব আমরা?

—তাহলে তুমি কী বলো?

—সে প্রশ্ন এখন থাক, সে কথা এখন আলোচনার দরকার নেই, আমি জানিই বা কি।

হোমানন্দ বললেন, আর তোমার ঈশ্বর?

—ঈশ্বর? ঈশ্বরকে তো গৃহস্থও ডাকতে পারে। আমি কি সন্ন্যাসী হয়ে তাদের চেয়ে কিছু বেশি পেয়েছি! আমি কি জীবনে কখনো ঈশ্বর সাক্ষাৎ করতে পারব? আমি বিশ্বাস করি না। রামকৃষ্ণদেব কি শ্রীচৈতন্যের মতো মহাপ্রতিভার পক্ষেই হয়তো তা সম্ভব; আমি তো ঠাকুর নিয়ে পুতুল খেলা করি!

স্তম্ভিত বিভ্রান্ত হতবুদ্ধি হোমানন্দ বললেন, তোমার এসব কথা শোনাও অপরাধ তবু জিজ্ঞেস করছি কেন তোমার মধ্যে এতদিন পরে এই সব উদ্ভট চিন্তা এল? এর কারণ কি ঐ শুক্তি?

—হ্যাঁ, শুক্তিই কারণ, আমার মনের গভীরে এই ধরণের চিন্তা ছিলই, আমি চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে চাই নি, কিন্তু পাঁচবছর আগে যেদিন শুক্তি এইখানে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, আমার মনে হল, আমি যেন মহাকালের বিশ্বরূপের সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হল, শুক্তি যেন আমার চোখ খুলে দিল, আমার সমস্ত জীবন-দর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমি বিশ্বের অনাদি অনন্ত অরূপকে দেখলাম শুক্তির মধ্যে।

—পরিষ্কার করে কথা বলো বীরেশ।

—পরিষ্কার! আমি সেদিন থেকে বুঝলাম, আমি ঈশ্বরের এই সৃষ্টি থেকে নিজেকে নির্বাসিত রেখে ভড়ং করছি, মানুষের সেবার নামে নিজেকে স্তোক দিচ্ছি। তাছাড়া সন্ন্যাসী হয়ে আর কিছু করবার নেই। আমার যা করণীয় ছিল, শেষ করে ফেলেছি। আমাকে এবার ছুটি দাও হোমানন্দ, আমি এবার বিদায় নোব!

হোমানন্দ থেমে থেমে বললেন, কিন্তু এই গৈরিক বর্ণের কি তাৎপর্য তা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়ই। ·

—আমি জানি, এই কল্পনা করা হয়েছে যে, গৈরিক বস্ত্র হল বিশ্বজননীর রজরঞ্জিত বসন। এই গেরুয়া কাপড়ে বীর্যপাত হলে মাতৃগমনের মহাপাতক হতে হবে। হোমানন্দ, আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেরুয়ার অমর্যাদা কখনো করি নি। আমার গেরুয়া কখনো রেতঃপাতে বীভৎস হয়নি। কিন্তু গেরুয়া আর আমি পরব না, বিশ্বমায়ের ঋতুরক্তে রাঙানো কাপড় পরে কেন বাহাদুরি করতে যাব? আমি মিথ্যা আত্মাভিমানে সন্ন্যাসী হয়েছি আর আমার অভিমান নেই। আমি জানি, এই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর আমি তাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক সৃষ্টি। আমি অদৃশ্য সেই অলখনিরঞ্জনের চরণে মাথা নামিয়ে দোব। বলব তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক আমি অভিমানে আর ভুগব না।

হোমানন্দ বললেন, তাহলে সেই বিরজা হোম, সেই অগ্নিসাক্ষী মন্ত্র উচ্চারণ, সেই প্রতিজ্ঞা, তার কোনো মূল্য নেই?

—মূল্য কেন থাকবে না হোম? কিন্তু সংসারে চিরস্থায়ী তো কিছু নয়, সবই পরিবর্তনশীল। আর পঁয়ত্রিশ বছরের সন্ন্যাস-ধর্ম আমার মধ্যে যে সংস্কার, যে পুণ্যময় বেদনা রচনা করেছে তার থেকে মুক্তি পাওয়াও তো সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বুঝেছি আমি মানুষের জন্যে কিছু করতে পারি নি, মানুষের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, মানুষের মনের অন্ধকার দূর করতে আমি কিছুই করতে পারি নি, পারবও না। তবু এই সন্ন্যাস ব্রত ছাড়ার কথা ভেবে আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছে, সে আগুনে সর্ব সত্তা পুড়ছে জ্বলছে। হয়তো আমৃত্যু এই চিতা জ্বলবে, তবু চিতা বয়েই আমাকে বেড়াতে হবে। আমি এই ভ্রান্তির কারাগার থেকে এবার মুক্তি চাই।

হোমানন্দ অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন,

বীরেশ, এ রকম চিন্তা সকল সন্ন্যাসীর মধ্যেই কখনো না কখনো জাগে। যেমন নাকি নীল আকাশ মেঘে ঢেকে যায়, বিদ্যুৎ চমকায়, ঝড় ওঠে। কিন্তু মেঘ বিদ্যুৎ ঝড় চিরদিনের নয়, নীলাকাশের অসীম আনন্দই চিরদিনের। তুমি ধ্যানে বসো, মনকে শ্রীগুরুর চরণ-পদ্মে স্থির কর। আমি এখন উঠি ভাই।

বলে হোমানন্দ উঠে পড়লেন।

মহারাজ দেখলেন বাগানের ভিতর দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছেন হোমানন্দ।

(৩)

মহারাজ উঠে ওঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বিছানার উপরে ধ্যানাসনে বসলেন। যেন গভীর সুষুপ্তিতে তাঁর বাহ্যচেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

শুক্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছিল, মহারাজ ভিতরে আসব?

কয়েকবার ডেকেও ও সাড়া পেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ডাকল, মহারাজ।

এতক্ষণে সাড়া পেল, কে শুক্তি? এসো ভেতরে এসে বসো।

শুক্তি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাজ আবার বললেন, বসো।

শুক্তি বসলে মহারাজ অনেকক্ষণ কথা না বলে স্থির হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, শুক্তি, আমি আজ রাত্রেই আশ্রম ছেড়ে চলে যাব।

শুক্তি ভীতিকর বিস্ময়ে বলে উঠল, সেকি!

মহারাজ বললেন, হ্যাঁ, আর দেরি করব না, আমি অনেকদিন ধরে ভেবেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি। আর দেরি করে লাভ নেই। আজ আশ্রমের কেউ জানবে না, হয়তো কাল জানবে, হয়তো আরও পরে জানবে, হোমানন্দের জন্যে আমি সিল-করা খামে চিঠি রেখে যাব।

মহারাজ অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, শুক্তি তোমাকেও

আমি সঙ্গে চাই। কালরাত্রে তুমি কি ঘুমোতে পেরেছিলে? তুমি কি কিছু ভেবেছ?

শুক্তি মাথা নেড়ে জানাল, ও কিছু ভাবে নি। কিন্তু শুক্তির দুই চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে ও মুখ চাপা দিল। শুক্তি বুঝতে পারছিল না, ও কেন কাঁদছে, মহারাজ চলে যাবেন বলেই কি ওর চারদিক শূন্য মনে হচ্ছিল? যেন বিশাল কোন মাঠে সন্ধ্যাবেলা ও একা দাঁড়িয়ে আছে খোলা আকাশের নীচে। নাকি মহারাজের সঙ্গে নতুন কোন উদ্ভট জীবন বরণ করে নিতে হবে বলে ভয় ও যন্ত্রণায় শিউরে উঠছিল?

মহারাজ বললেন, শুক্তি, আমার সঙ্গে যেতে তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তুমি যেও না। আমি নিঃসঙ্গতার দীক্ষা নিয়েছিলাম আর নিঃসঙ্গই থেকে যাব। মৃত্যুও তো নিঃসঙ্গতা।

মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে শুক্তি কান্নাভিজে গলায় থেমে থেমে বলল, মহারাজ, কাল রাত্রে আমি কিছু ভাবিনি। রাত্রি জেগে ভালোমন্দ বিচার করবার ইচ্ছা আমার হয় নি। আমার অল্প বয়েসে বাবা মারা গিয়েছেন, মা আমাকে ফেলে পরলোকে গেল। তারপর এতবড় পৃথিবীতে আপনিই আমার সব। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনার ভালোই আমার ভালো। আমার সব ভালো মন্দ, সব জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক আমি আপনার চরণে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

মহারাজ বললেন, শুক্তি, আমি গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যেতে চাই। বহুদিন ধরে চিন্তা করে, দেখে দেখে আমার মনে হয়েছে যে, গার্হস্থ্যজীবনই স্বাভাবিক আর শ্রেষ্ঠ জীবন। সেখানে ভড়ং নেই, ন্যাকামি নেই, কপটতা নেই, মানুষ সেখানে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারে। পশুপাখি সবাই কোনো-না-কোনো অর্থে গার্হস্থ্যজীবনই যাপন করে। আগেকার মুনিঋষিরাও অরণ্যে তপোবনে গার্হস্থ্যজীবনই যাপন করতেন।

একটু থেমে বললেন, শুক্তি, তুমি যদি সে জীবনে আমার হয়ে না থাকো তাহলে এই বয়েসে আমি কি নিয়ে থাকব!

শুক্তি বলল, মহারাজ, আমিই বা আপনাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব! সেই ভীষণ নিঃসঙ্গতা আমি কেমন করে সহ্য করব!

একটু থেমে বলল, কিন্তু মহারাজ, আপনার সুনামে যে কলঙ্ক লাগবে, চারদিকে লোকে যে আপনাকে নিয়ে কুৎসিত কথা বলবে, আপনি যে

মানুষের ঘৃণা আর নোংরা আলোচনার বিষয় হবেন, আপনার নাম তারা রাজার আসন থেকে নামিয়ে যে নর্দমার কাদায় মিশিয়ে দেবে !

মহারাজ বললেন, শুক্তি, লোকে নানান কথা বলে, তাতে সত্য কলুষিত হয় না। সত্য নিষ্ঠুর কিন্তু পবিত্র। যদি আমার উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্ত সত্য হয়, এই লোকেরাই আবার আমার নাম স্মরণ করবে। আর সত্যিই যদি আমি পাপ কিছু না করে থাকি তাহলে আমি ঠুনকো লোকনিন্দায় কেন আমার সত্যকে ত্যাগ করব !

শুক্তি কথা না বলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

মহারাজ বললেন, এখন কাজের কথা বলি। আমার কিছু টাকার দরকার। কেননা আশ্রমের কিছুই আমি আর নিতে পারব না। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিজের বলতে সবই নিয়ম মতো ত্যাগ করেছি। এখন টাকা তুমিই আমাকে দেবে।

শুক্তি বলল, মহারাজ, আমার যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু নিয়ে আমার বাকী মাইনে তো এতদিন আশ্রমকেই দিয়ে এসেছি।

মহারাজ বললেন, তাহলে তোমার হাতের একগাছি বালা বাজারের মোড়ে বন্ধকী দোকানে বন্ধক দিয়ে টাকা নাও।

উনি ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিলেন কোন দোকানে বন্ধক দেওয়া যাবে তারপর আবার বললেন, আমার জন্যে এক জোড়া ধুতি আর পাঞ্জাবি কিনবে, স্টেশনে গিয়ে কলকাতার একখানা টিকিট কিনবে আর বাকী নগদ টাকা আমাকে দেবে।

শুক্তির চোখ ফেটে আবার জল গড়িয়ে পড়ল। এবার ও আর আঁচল দিয়ে চোখ মুছল না। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

মহারাজ বললেন, তোমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে তো আমি আর কিছু চাইতে পারি না শুক্তি। আমার সব দাবী সব চাওয়া এখন থেকে তোমারই কাছে।

সামান্য থেমে মহারাজ আবার বললেন, শুক্তি, আমি কলকাতা গিয়ে কোনো হোটেলে উঠব। তারপর বাড়ি-ভাড়ার চেষ্টা করব, চাকরি বা উপার্জনের কোনো উপায় খুঁজব আর বিয়ের রেজিস্ট্রেসনের নোটিশ দিয়ে রাখব। আমি চিঠি লিখলে তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় আমার কাছে চলে যাবে।

শুক্তি মাথা নিচু করে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে মহারাজের সব কথাই শুনে গেল।

মহারাজ বললেন, সন্ধে হয়ে আসছে, আর তুমি দেরী কোরো না, যাও বাজারে গিয়ে কাজগুলো সেরে এসো।

শুক্তি মাথা নত করে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। ওর চোখ থেকে নীরব অশ্রুর ফোঁটাগুলো মেঝেতে ঝরে পড়ছিল। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে ও উঠে দাঁড়াল। 'আমি আসছি' বলে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুক্তির এত অপরিসীম ক্লান্তি লাগছিল যে ওর মনে হচ্ছিল ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বাগানের ভিতর ঢুকে একটি আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে ও দাঁড়িয়ে রইল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল কয়েকবার। আবার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল। চীৎকার করে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ওর আর্ত হাহাকারকে পৌঁছে দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল ওর। দ্রুত আলো মুছে আসছিল। বাগানের ভিতরে গাছের তলায় তলায় অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এসেছিল। পাখিরা দলবদ্ধ ভাবে দিনান্তের শেষ ডাকাডাকি সেরে নিচ্ছিল। কতক্ষণ অমনি করে দাঁড়িয়ে থেকে শুক্তি বাগান পেরিয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে চলল। যেন ও নিজে যাচ্ছিল না। কোনো অদৃশ্য শক্তি ওকে টেনে নিয়ে চলছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন শূন্যে ভেসে ভেসে চলেছে। ওর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই।

স্টেশনের কাছাকাছি বাজারের মোড়ে পৌঁছে ও থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ যেন ও আচ্ছন্নতার মধ্যে রাস্তা হাঁটছিল। ঠিক কি যে ও ভাবছিল তাও ওর কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু দুঃসহ অনুভূতির এক ভয়ঙ্কর গুরুভার যেন ওর বুকের ভিতরে চেপে বসে ছিল।

সামান্য এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করেই ও বন্ধকী দোকানটা চিনতে পারল। দুরু দুরু বুকে বহুকষ্টে ও দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখন ওর গলা শুকিয়ে গেছে। কে যেন ওর গলার টুঁটি টিপে ধরেছে বলে মনে হল ওর। দোকানে ভিড় ছিল না। দোকানদার জিজ্ঞেস করল, কি মা, কি চাই?

শুক্তি ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, এই বালাটা বন্ধক দোব।

—দেন তাহলে, দেখি ওজন করে।

শুক্তি বাঁ হাত থেকে বালাটা খুলে দোকানদারের হাতে দিল।

ওজন-টোজন করে দোকানদার শুক্তিকে শুধোল, আপনার কত টাকা চাই ?

—ধরুন তিনশ।

—তিনশ ? দেড় ভরি আছে, তাশ তিনেক টাকা দেওয়া যায়। তাহলে রসিদ লিখি ?

—লিখুন।

দোকানদার রসিদ আর তিন শ টাকা শুক্তির হাতে তুলে দিল।

টাকা নিয়ে কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল শুক্তি। পছন্দ করে খুব দামী ছুখানা ধুতি, ছুখানা আদ্দির পাঞ্জাবি, ছুটো গেঞ্জি কিনল। সামান্য ইতস্তত করে এক জোড়া আণ্ডারওয়্যারও কিনে ফেলল।

মন বলল, ছি, ছি !

কিন্তু ও মনকে বলল, তাতে কি, কাপড় পরতে হলে এতো চাইই, আমি কি করব ?

খবরের কাগজে মুড়ে জিনিসগুলি বেঁধে দিল দোকানদার। প্রায় একশ টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর স্টেশনে গিয়ে কলকাতার টিকিট কিনল ফার্স্ট ক্লাসের।

সন্ধে পার হয়ে গেছে। সন্ধের পর মেয়েদের আশ্রমের বাইরে থাকবার নিয়ম নেই। অত্যন্ত দ্রুত পায়ে হাঁটছিল শুক্তি। আবার সেই বাগানের ভিতর দিয়ে অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে ও মহারাজের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হযতো বা পায়ের শব্দ শুনেই মহারাজ বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, ঘরে এসো, আমি তোমাকে পাঠিয়ে বড় উৎকণ্ঠায় ছিলাম।

শুক্তি কথা না বলে মহারাজের সঙ্গেই ঘরে ঢুকে বিছানার উপরে সেই খবরের কাগজের মোড়ক আর বাকী টাকা রেখে দিল।

মহারাজ বললেন, আমার অনুরোধেই কয়েকমাস আশ্রমে টাকা না দিয়ে ঐ বালাছুটো তুমি কিনেছিলে। তোমার হাত ছুটি বড় শূন্য লাগত বলে আমি বালা পরতে বলেছিলাম। আজ আমিই আবার তোমার হাত শূন্য করলাম। যতদিন না ঐ বালা আবার তোমার হাতে উঠছে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না। রসিদটা যত্ন করে রেখো।

শুক্তি হঠাৎ বলল, মহারাজ, আশ্রম ছেড়ে গৈরিক ছেড়ে না গেলেই কি নয়?

মহারাজ বললেন, আমি যাবই শুক্তি। তোমার যদি মনে হয় যে, শুধু তোমার জন্যেই আমি যেতে চাইছি তাহলে ভুল বুঝেছ তুমি। যাতে আমার আর আস্থা নেই তা নিয়ে আমি পড়ে থাকতে পারব না।

শুক্তি বলল, মহারাজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার উপরে যে ভীষণ ঝড়-ঝাপ্টা, অপমান-লাঞ্ছনা দুঃখ আসবে, সেই কথা ভেবে আমার শান্তি নেই।

মহারাজ বললেন, অভ্যস্ত জীবনের বাইরে যেতে চাইলেই তাতো সইতেই হবে শুক্তি। তবে এও আমি জানি যে, ঝড় ঝাপটা বেশিদিন থাকবে না। যে ঈশ্বরকে আমি সর্বব্যাপারে মনে মনে ডেকেছি তিনি আমাকে তোমাকে রক্ষা করবেন। এই প্রার্থনা করো, আমি যেন ধর্মভ্রষ্ট না হই, আমি যেন সত্যকে মেনে নিতে পারি।

একটুখানি চুপ করে থেকে মহারাজ নিবিষ্টভাবে শুক্তিকে দেখলেন। তারপর বললেন, তোমার যদি মন না হয় তাহলে তুমি এখানেই থেকো অথবা যা ইচ্ছা কোরো। তুমি এলে আমি আনন্দিত হব। কিন্তু তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে বলব না। যতদিন খুশি নানান দিক থেকে ভেবে চিন্তে নিজেকে ভালো ভাবে বুঝে তারপরে তুমি সিদ্ধান্ত নিও। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।

শুক্তি বলল, তাহলে এখন আমি যাই মহারাজ, আর বোধহয় আশ্রমে আপনার দেখা পাব না। বলে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে মহারাজের দুই পায়ের উপরে মুখ রেখে দণ্ডবৎ প্রণামে নত হয়ে রইল শুক্তি। ওর দু চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় জল ঝরে পড়ছিল। মহারাজ অনুভব করছিলেন ওঁর পাদুটি যেন শুক্তির তপ্ত অশ্রুজলে পুড়ে যাচ্ছে। মহারাজের বুকের ভিতরে বিপুল কোন বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তিনি চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেক পরে শুক্তি চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। তখন ওর দুচোখের পাতা ভিজে, চোখদুটি লাল হয়ে উঠেছে। ভাঙা গলায় ও বলল, মহারাজ আমি আসি তাহলে।

—এসো, ভয় পেয়ো না, আমি তো রইলাম, যা ভালো মনে হবে করবে, আমাকে প্রতিবন্ধক বা বাধা মনে কোরো না।

শুক্তি বলল, আমার আর ভাবনার কিছু রইল না মহারাজ। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই আমার জীবন ধন্য হবে।

বলে ধীর পায়ে ঘর থেকে চলে গেল।

মহারাজ বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন, যতক্ষণ দেখা গেল তৃষিত চোখে শুক্তিকে দেখলেন। তারপর শুক্তি অন্ধকারে ঢেকে গেল। মহারাজ ঘরের বারান্দা থেকে নেমে সামনের উঠোনে পায়চারি শুরু করলেন। অশ্রান্তভাবে তিনি হেঁটে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত চেতনা ইন্দ্রিয় তাঁর হৃদয়ে বন্দী ছিল। তিনি জানতেও পারলেন না যে কখন চাঁদ উঠেছে, চারদিকে গাছপালা লতাপাতার ছায়া বিচিত্র ভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে, ঝিঁঝিঁ ঝঙ্কারে চারদিক মুখরিত।

একজন ব্রহ্মচারী এসে দাঁড়াল, মৃদুগলায় বলল, মহারাজ!

মহারাজ চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মচারী বলল, মহারাজ হোমানন্দজী আমাকে পাঠালেন।

—কি বলো?

—আপনি খেতে যাবেন না মহারাজ?

—না, আজ আমি খাব না। হোমানন্দকে বলো আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

ব্রহ্মচারী চলে গেল।

মহারাজ চারদিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। উদ্দাম বাতাস বইছে। এই বাগান, এই লতাপাতা, এই মাটির কুটীর তাঁর কাছে সহসা স্বর্গের কোনো দৃশ্য বলে মনে হল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মহারাজ তাঁর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ক্লান্তি লাগছে, কপালে ঘাম জমে উঠেছে তাঁর। আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ যে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন কে জানে।

চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে আবার তিনি জপ করতে লাগলেন। বিছানাতে জেগেই শুয়ে রইলেন মহারাজ। নিজেকে অবিচল স্থির রাখতে আজ তাঁকে দুঃসহ যন্ত্রণা পেতে হচ্ছিল। এতদিন সহস্র দায়-দায়িত্বের মধ্যে, নানান সঙ্কটে তিনি জানতেন তিনি একা নন। এই আশ্রম, এই প্রতিষ্ঠান তাঁর সঙ্গে আছেন। আর আজ সব দায়-দায়িত্ব তাঁকে একা বইতে হবে, সব

সিদ্ধান্ত তাঁকে একা নিতে হবে, সব পাপপুণ্যের ফল ভোগ তাঁকে একাই করতে হবে। শুধু নিজের জীবন নয় আরও একটি সুকুমার পবিত্র জীবনের দায়িত্ব তিনি ভালোবেসে মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন।

বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বাললেন মহারাজ। দেখলেন ঘড়িতে একটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। রাত্রি একটায় যে ট্রেন আছে সেই ট্রেন তিনি ধরতে চান। অন্ধকারে লুকিয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। তিনি দ্রুত তাঁর গেরুয়া পোষাক ছেড়ে ফেললেন। চোখ জ্বালা করে উঠল। হু হু করে চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল। কিন্তু তিনি নিরস্ত হলেন না। ক্ষিপ্রহাতে নিজের সঙ্কল্পের কাজ করে চললেন। নতুন ধুতি গেঞ্জি পাঞ্জাবি পরে নিয়ে পরিত্যক্ত গেরুয়া বসন ভাঁজ করে বিছানায় রাখলেন। আর একখানি ধুতি পাঞ্জাবি কাগজে মুড়ে নিলেন। শুক্তির দেওয়া শ' দুই টাকা, রেলের টিকিট সাবধানে ভিতরের পকেটে রাখলেন। জুতো পরে নিয়ে আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় শেকল তুলে দিলেন।

এই আবছা চন্দ্রালোকিত কুহকী পরিবেশে চিরপরিচিত আশ্রমকে তাঁর অত্যন্ত করুণ, গম্ভীর ও শোকাচ্ছন্ন মনে হল। তিনি বাগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তারপর মাঠের দিকে হেঁটে চললেন। তিনি জানেন, আশ্রমের নাইটগার্ড এদিকে থাকে না, এদিকে পাহারা দেবার কিছু নেই। আর স্টেশনও এদিকেই। আশ্রমের এলাকা পেরিয়ে পিছন ফিরে একবার দাঁড়ালেন। শাল-মহুয়ার ঘনসন্নিবদ্ধ মাথাগুলি আর নানান গাছপালার ভিতরে ভিতরে আশ্রমের উঁচু বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে। এই অস্বচ্ছ চাঁদের আলোয় সব কিছুই কেমন মায়া ও বেদনাময় মনে হচ্ছে। হয়তো এখন শুক্তিও বিছানায় বিনিদ্র জেগে আছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। অলস মন্থর অর্থহীন সন্ন্যাসজীবন তাঁর কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর আত্ম-অবমাননা বলে মনে হচ্ছিল। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, যখন দেশের মানুষের জন্যে তিনি সত্যিকার কিছুই করতে পারবেন না তখন কেন গেরুয়া-সাজে সেজে জরদ্গবের মতো দিন কাটাবেন? কেন তিনি লোকসমাজের মধ্যে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বাঁচবেন না? মহারাজ আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে চললেন।

স্টেশনের কাছে গিয়ে তিনি গেট দিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকতে চাইলেন না।

এখানে সবাই তাঁকে চেনে। এই পোশাকে দেখলে বিভ্রান্ত হতচকিত হয়ে পড়বে। তিনি খানিক ঘুরে গিয়ে লাইন পেরিয়ে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়াগাছটির ঘন ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ট্রেন আসতে দেরি ছিল না। কয়েক মিনিট পরেই ট্রেন এসে প্লাটফর্মে ঢুকল। মধ্যরাত্রির ট্রেন। লোক বেশি নেই। অধিকাংশ ঘরই ফাঁকা পড়ে আছে। শুক্তি ভালোবেসে ওঁর জন্যে ফার্স্টক্লাসের টিকিট কিনেছে। উনি তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে ফাঁকা এক ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে দরজা লক করে দিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল ওঁর বুকের মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁ ডাকছে। চারদিক বড় নিঃশব্দ, শূন্যময় মনে হল। ট্রেন ছেড়ে দিল। প্লাটফর্ম পেরিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল ট্রেন। মহারাজ সিটে গিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

(৪

বীরেশ মহারাজ হাওড়া স্টেশনে এসে যখন নামলেন তখন আটটা বেজে গেছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিলেন। শিয়ালদা অঞ্চলের এক হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। হোটেলের অফিসে উনি ম্যানেজারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ম্যানেজার বলল, বলুন!

মহারাজ বললেন, আপনার হোটেলে একা থাকবার কোনো ঘর আছে?

—আছে।

—থাকা খাওয়া নিয়ে ডেলি কত লাগবে?

—পনের টাকা। সকালে টিফিন, দুপুরে মিল, বিকেলে চা-বিস্কুট, রাত্রে মিল, আর সিটরেণ্ট, সব মিলিয়ে পনের টাকা।

মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে দুশ টাকারও কিছু কম আছে। এখন গামছা, টুথপেস্ট ব্রাশ, তেল, সাবান, দাড়িকামানোর সরঞ্জাম

এইসব নানান টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে। লন্ড্রীর খরচ আছে। প্রতিদিন অন্তত দুখানা করে ইংরেজি কাগজ কেনা দরকার। এখন থেকে চাকরির বিজ্ঞাপনই তাঁর একমাত্র পাঠ্য বিষয় হয়ে উঠবে। তাহলে এই টাকায় ক'দিন তিনি চালাতে পারবেন, বুঝতে পারলেন না। বললেন, আমি ঘরটা নিতে চাই, এখন এ্যাডভান্স কিছু দিয়ে দোব।

মহারাজ পকেট থেকে টাকা বার করে পঞ্চাশ টাকা ম্যানেজারের হাতে দিলেন। ম্যানেজার টাকাটা খাতায় জমা করে নিয়ে খাতির করে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

ম্যানেজারের সঙ্গে মহারাজ দোতলায় উঠে গেলেন। লম্বা বারান্দা পার হয়ে শেষ ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যানেজার। হাত দিয়ে ঠেলে দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকল। মহারাজও ঢুকলেন।

ম্যানেজার বলল, এ ঘরটার সঙ্গে এ্যাটাচড্ বাথরুম পায়খানা আছে, এই ধরণের ঘরের ভাড়া আমরা একটু বেশি নিই।

ঘর পছন্দ হয়ে গেল মহারাজের। পুব দিকে একটি জানলা। ছোটখাট পরিষ্কার বিছানা মশারি। একটি চেয়ার ও আয়না-বসানো টেবিল। মেঝেতে কার্পেট পাতা। ওপরে ফ্যানও আছে।

ম্যানেজার শুধোল, ঘর পছন্দ হয়েছে আপনার?

—হ্যাঁ, বেয়ারাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, আমার ক'টা জিনিস আনতে হবে।

—আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলে ম্যানেজার চলে গেল।

দুপুরে স্নানাহার সেরে বীরেশ মহারাজ বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর মাথার কাছে দুখানা ইংরেজি খবরের কাগজ। একটি কাগজ তুলে নিয়ে তিনি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভগুলি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এসব দেখবার তাঁর কখনো দরকার হয় নি। আজ এই ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরের দীর্ঘ সারির উপরে চোখ বুলতে গিয়ে তিনি নতুন ও জটিল এক জগতের আভাস পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর যোগ্য কোনো চাকরিরই তিনি সন্ধান পেলেন না। বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে তাঁর চোখ ব্যথা হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে কাগজ রেখে দিয়ে তিনি জানলা দিয়ে তাকালেন। তাঁর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠল। পর্দা ঢাকা এই ঘরকে তাঁর পিঁজরেপোল বলে মনে হল। সঙ্গে

সঙ্গেই আশ্রমের তাঁর সেই মাটির ঘর, বাগান, লতাপাতা, ব্যাপ্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্তে তাঁর সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল তৃষিত হয়ে উঠল। কিন্তু এ চিন্তাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

চাকর চা নিয়ে এলে চা খেলেন। তারপর বাইরে একটু ঘুরে আসবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। গোলদীঘির ধারে গিয়ে একটু বসবার ইচ্ছে হল তাঁর। মহাত্মাগান্ধী রোড ধরে তিনি হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ এক দিব্যকান্তি যুবক তাঁর পথ আটকে দাঁড়াল, মহারাজ!

যুবকের গলার স্বরে বিস্ময়, অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসা ছিল।

মহারাজ যুবকের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন, বুঝলেন এখন থেকে বারংবার এই ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে।

মহারাজ চিনতে পারলেন, দ্রুত নিজেকে সপ্রতিভ করে জিজ্ঞেস করলেন, অনিরুদ্ধ রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে দেখছি।

—তোমাকে ভুলে যাওয়াই তো আশ্চর্য।

—কিন্তু আপনি এদিকে কোথায়?

—একটু বেড়াতে বেরিয়েছি, যাবে আমার সঙ্গে?

—সানন্দে, আমার এখন তো কোনো কাজ নেই, চলুন।

ওঁরা দুজনে গিয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের নিরিবিলি এককোণে ময়ূরের খাঁচার ওপাশে বেঞ্চিতে বসলেন।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

মহারাজ হঠাৎ চোখ তুলে অনিরুদ্ধকে মুগ্ধ হয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। অনিরুদ্ধ পরম রূপবান। প্রমাণি উচ্চতার মানুষ। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামচিক্কণ। এই রকম রঙকেই বোধহয় নবদূর্বাদলশ্যাম কিংবা ঘনশ্যাম বলে বর্ণনা করেছেন প্রাচীন মহাকবিরা। মাথায় ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো গভীর ঘন চুল কপালের উপরে অনেকখানি উঁচু হয়ে আছে, কানের আধখানা ঢেকে রেখেছে, পিছন দিকে পেখমের মতো চুলের গোছা ঢেউ খেলে আছে। ঈষৎ রুক্ষ স্বাস্থ্যবান চুল; চাঁচর চিকুর হয়তো একেই বলে। আকাশের মতো প্রশান্ত কপালের নীচে কাশের শিসের মতো সুদীর্ঘ টানা টানা দুটি ভুরু। আর চোখদুটির তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। কি আশ্চর্য চোখ, পদ্মপলাশ-

লোচন কি একেই বলে? চোখের দিকে তাকালে সম্মোহিত হতে হয়। অগ্নিগর্ভ সমুদ্র যেন এ চোখ, উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দুটি চোখের দিকে তাকালে কখনো মনে হয় গোখরোর চোখ হয়তো এমনই হবে আবার হরিণনয়নের কোমল ছায়ারও যেন ছড়াছড়ি। টিকোলো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নাক। পরিষ্কার করে কামানো মুখের ঠোঁটদুটি যেন বাঙ্ময় হয়ে আছে, দৃঢ়তা আর মাধুরীতে মাখামাখি এই ঠোঁট মনে স্নেহ, ভালোবাসা আর খুশি যেন উদ্বেল করে তোলে। আর ওর সমগ্র মুখমণ্ডলে এমন এক ছন্দ, দৃঢ়তা আর তীব্র মাধুর্য আছে যে ওর মুখের দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। গভীর সাধ হয় ভালোবাসতে। ওর সুন্দর সুগঠিত গলার নীচে প্রশস্ত কাঁধ, চওড়া পাহাড়ের মতো বুক। এখন ও পরে আছে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। বাহু ও হাতের দিকে তাকালেন মহারাজ। তরুণ শাল-কাণ্ডের মতো নিটোল পেশল লাবণ্যময় বাহু। চওড়া শক্ত কবজি, আঙুলগুলি লতিয়ে আছে। নখের রঙ উজ্জ্বল। এবং মহারাজের মনে হল, অনিরুদ্ধের হাতদুটি নিশ্চয়ই আজানুলম্বিত, এত দীর্ঘ হাত তিনি আগে কখনো দেখেন নি। মহারাজ ভাবছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের চেহারা কি এমনি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ কি এমনি দেখতে ছিলেন? এত আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ তিনি জীবনে কখনো দেখেন নি। যখন অনিরুদ্ধকে উনি প্রথম দেখেছিলেন তখন ওর বয়স অল্প। এতখানি সুন্দর বোধহয় তখন ও ছিল না। কিন্তু এখন ওর সর্ব অবয়বে ব্যক্তিত্ব যেন পূর্ণবিকশিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায়। অকারণেই চকিতে একবার শুক্তিকে মনে পড়ল মহারাজের। অনিরুদ্ধের পাশে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শুক্তিকে একবার কল্পনা করে তিনি নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, বলুন কিছু?

—তুমি তীব্র কৌতূহলে ভুগছ তো? তোমার এই কৌতূহলের ছটফটানি আমার উপভোগ করতে ভালো লাগছে।

অনিরুদ্ধ হা হা করে হেসে উঠল।

মহারাজ দেখলেন ওর ডালিমের দানার মতো স্বাস্থ্যবান সাজানো সুন্দর দাঁতের সারি। আহা কি সুন্দর ওর হাসি! এমন করে উচ্ছল আনন্দে হাসতে পারে সেই মানুষ যার আছে প্রচুর স্বাস্থ্য আর অফুরন্ত জীবনীশক্তি। এই মানুষের বিরাট কিছু হওয়া উচিত ছিল। কি করে ও, কেমন করে বাঁচে, জানতে কৌতূহল হল মহারাজের।

মহারাজ শুধোলেন, অনিরুদ্ধ, তুমি কি করছ এখন ? কোথায় আছ ?

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, আপনি জানেন তো, আমার বাবা আমার ছেলেবেলায় মারা গিয়েছেন, আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। আমার বিধবা মা আমাকে বহু কষ্টে মানুষ করেছে।

একটু থেমে বলল, মানুষ কথাটা বলা হয়তো ঠিক হল না, ও কথার কথা. মা অনেক কষ্টে আমাকে বড় করেছে।

মহারাজ বললেন, না অনিরুদ্ধ আমার বয়েস হয়েছে, হয়তো কিছুটা অন্তর্দৃষ্টিও আছে, তুমি সত্যিই মানুষ হয়েছ, তোমার মায়ের পরিশ্রম সার্থক।

অনিরুদ্ধ কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি ইংরেজিতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে আপনার আশ্রমের স্কুলে মাস্টারি পেয়ে চাকরি করতে গিয়েছিলাম। তারপর আপনি জানেন, অদ্ভুতভাবে আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধল।

—হ্যাঁ আমি জানি, আশ্রমে বড়লোকের ছেলেদের বেশি খাতির করা হয় বলে তুমি অভিযোগ করেছিলে, ছাত্রদের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার ঢোকানো হচ্ছে বলে তুমি প্রতিবাদ করেছিলে, আশ্রম কর্তৃপক্ষের ডিকটেটারি মনোভাবের বিরুদ্ধে তুমি খেপে উঠেছিলে, আর আমি তোমাকে আশ্রম থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিলাম।

—হ্যাঁ, আপনি আমাকে অতিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার এম.এ.র রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, আর সব শুনে মা জিদ করে চলে আসতে বলল তাই চলে এসেছিলাম। আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, তা কিন্তু নয়।

—হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি, তুমি ভয় পাবার ছেলে ছিলে না।

একটু থেমে মহারাজ আবার বললেন, অনিরুদ্ধ, আমি তোমাকে তখন সহ্য করতে পারি নি ঠিকই, কিন্তু তোমার সেইসব ক্ষুরধার যুক্তি, তোমার সেই হাতুড়ির মতো কথা আমার ভিতরে কোথাও প্রচণ্ড চোট দিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে আমার দৃষ্টিভঙ্গী, আমার জীবনদর্শন একেবারে পাল্টে গিয়েছিল। যাই হোক তাহলে তুমি এখন কি করছ ? এম.এ.তে তোমার রেজাল্ট কি হয়েছিল ? যতদূর মনে পড়ে তুমি তো ইংরেজি অনার্সে ফার্স্টক্লাস ছিলে।

অনিরুদ্ধ হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে গেল, নম্র হয়ে বলল, এম.এ.তে আমি প্রথম হয়েছিলাম মহারাজ, এখন এক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছি।

—বাঃ শুনে বড় খুশি হলাম অনিরুদ্ধ।

আবার দুজনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন।

তারপর মহারাজ বললেন, এবার তোমার কৌতূহল মেটানো দরকার। তাছাড়া আমি এখন নির্বান্ধব। তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবেও পেতে চাই। অতএব স্পষ্ট ভাবেই দুএক কথায় তোমাকে সবই বলছি।

একটুখানি চুপ করে কিছু ভাবলেন মহারাজ, তারপর বললেন, অনিরুদ্ধ, আমি সন্ন্যাসধর্ম এবং গৈরিক ত্যাগ করেছি। সন্ন্যাসী হিসেবে ঐ আশ্রমে যা করবার ছিল আমি তা সম্পূর্ণ করেছি, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঐ কাঠামোতে নতুন কিছু আর করবার ছিল না। তাছাড়া আমি যে জন্যে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যাদের গান্ধীজী বলেছেন হরিজন, আমরা বলতাম নরনারায়ণ, সেই ক্ষুধিত, নিরক্ষর, অপমানিত, অসহায় কোটি কোটি মানুষের জন্যে আমি কিছুই করতে পারি নি, পারা সম্ভবও ছিল না। তাছাড়া আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছি অনিরুদ্ধ, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে এই বয়সে ভালোবেসে ফেলা কি যে দারুণ ট্রাজেডি তোমাকে বোঝাতে পারব না, কেউ বুঝবে না।

মহারাজের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, বাক্‌রুদ্ধ হল, তিনি নিজেকে সংযত করতে নীরব হলেন।

আবার দুজনে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

তারপর অনিরুদ্ধ বলল, অসাধারণ আপনার মনোবল, না হলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মহারাজ বললেন, তা জানি না, তবে প্রেমে পড়ে সন্ন্যাসীর ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আমি ভণ্ডের মতো গৈরিক অঙ্গে রাখতে পারছিলাম না।

—মহারাজ আপনি কি দরিদ্র মানুষের জন্যে নতুন কিছু করার কথা ভাবছেন?

—আর তা সম্ভব নয় অনিরুদ্ধ। নতুন করে কিছু করার মতো শক্তি বা উদ্যম আর আমার অবশিষ্ট নেই। আমার ইচ্ছে, সমস্ত ভড়ং বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো আমি গৃহস্থ হব। শেষ জীবনটুকু আমি নিঃশব্দে সকলের অগোচরে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে বাঁচব।

—তাহলে এখন কি করছেন? কোথায় আছেন?

—আমার উপার্জনের একটা উপায় করতে হবে, এখন আমি আছি একটা

হোটেলে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা যাবে না, অনেক খরচ, তুমি অল্প ভাড়ায় আমাকে একটা বাড়ি দেখে দিতে পার, আর একটা চাকরি, যাতে দুজনের খেয়ে পরে চলতে পারে।

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, বাড়ির জন্যে ভাববেন না। কলকাতায় আমাদের একটা দোতালা বাড়ি আছে। আমরা মা-ছেলে দোতালায় থাকি। এক তলাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। আপনি আমাদের বাড়িতে এসে থাকুন।

মহারাজ বললেন, মাসে কত দোব আমি তোমাকে?

—কিছু দিতে হবে না, আপনি থাকবেন সে তো আমাদের সৌভাগ্য।

—না তা হয় না অনিরুদ্ধ, গোটা একতলাটাই আমার চাই, আমি একা থাকবনা, আর গৃহস্থ হতে চেয়ে আমার ভিক্ষা নেওয়ার অধিকারও আর নেই।

—ঠিক আছে, যা ইচ্ছে হয় দেবেন, আমি আপনার কোনো ইচ্ছাতেই বাধা দোব না, দেওয়া উচিত হবে না, আপনি বহুদর্শী জ্ঞানী মানুষ।

—আর উপার্জনের কি হবে অনিরুদ্ধ?

অনিরুদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বলল, মহারাজ, কিছু মনে করবেন না, আমার জানা দরকার, আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেসন—

—আমি আই.এসসি. ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিলাম অনিরুদ্ধ, তারপর আর পড়া হয় নি।

—আচ্ছা, আমার বন্ধুবান্ধব নানান জায়গায় আছে, কোনো ফার্মে আমি চেষ্টা করে দেখব, তবে বোধহয় সময় লাগবে, চট করে কিছু হবে বলে মনে হয় না।

—সময়, সময় তো লাগবেই, তাড়াতাড়ি কিছুই হয় না অনিরুদ্ধ, কিন্তু তুমি ব'লো তোমার বন্ধুদের যে আমি অত্যন্ত যোগ্য মানুষ। বহুদিন আশ্রমের সেক্রেটারী ছিলাম তো, যে কোনো কাজই আমি সুষ্ঠুভাবে করতে পারব। ইংরেজি ভাষাটা আমি লিখতে পারি, বলতে পারি।

—আমি জানি মহারাজ, অত ব্যাকুল হবেন না, একটা কিছু হয়ে যাবেই।

দুজনেই যেন কথার অভাবেই আবার নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, তাহলে আজকেই চলুন আমাদের বাড়ি।

মহারাজ বললেন, না, আজ থাক, আমি হোটেলে কিছু এ্যাডভান্স

করেছি। চারদিন পরে তোমাদের ওখানে যাব। তার মানে রবিবারে এসো তুমি, বেলা এগারোটা নাগাদ আসবে।

একটু থেমে বললেন, সেদিন সেই মেয়েটিও হয়তো আমার সঙ্গে থাকবে।

হঠাৎ চুপ করে গিয়ে তারপর চিন্তিত ভাবে আবার বললেন, এখনও আমাদের বিয়ে হয় নি। শীঘ্রি রেজিস্টারি নোটিশ দোব, তার মানে মাস খানেক দেরি হবে, হয়তো তোমাকেই আমার বিয়ের সাক্ষী থাকতে হবে। এই অবস্থায় তোমাদের বাড়ি গেলে তোমার মা বিরক্ত হবেন না তো?

—না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মা আমার 'গোরা'র 'আনন্দময়ী' একেবারে। কোনো রকম গোঁড়ামি কুসংস্কারের তিনি ধারও ধারেন না।

—তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে অনিরুদ্ধ। সন্ধে হয়ে আসছে। চলো আমরা উঠি।

দুজনে উঠে দাঁড়ালেন, হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় এসে পড়লেন।

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, চলো আমার সঙ্গে গিয়ে হোটেলে আমার ঘরটা চিনে আসবে।

দুজনে হোটেলের দিকে আগিয়ে চললেন। অনিরুদ্ধর পাশে হাঁটতে হাঁটতে আনন্দময় এক অনুভূতিতে মহারাজ অভিভূত হচ্ছিলেন। যেন বহুভাগ্যে বহুবাঞ্ছিত এক বন্ধু পেয়ে তাঁর মনের দুঃসহ যন্ত্রণার কিছু উপশম হল। গভীর প্রীতি নিয়ে পাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বারংবার তিনি অনিরুদ্ধকে দেখতে লাগলেন।

(৫)

সাধা
সকলে পরের দিন বীরেশ মহারাজ হুগলী জেলার একটা গ্রাম্য স্টেশনে ট্রেন
নামলেন। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন ধু ধু দুপুরের ঊদাসীশূন্যে
ঝক্ঝক্ শব্দ করে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। এবার চারদিকে
য়ে দেখলেন তিনি। পঁয়ত্রিশ বছর আগে একদিন ভোর রাত্রে এই

স্টেশন থেকে তিনি শেষ বিদায় নিয়েছিলেন। গাঁয়ের কাঁকর-বিছোনো স্টেশন। অল্প যে দুএক জন লোক নেমেছিল তারা স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। চৈত্রের চড়া রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বছরে স্টেশনটির যেন কোনো পরিবর্তনই হয় নি। প্লাটফর্মের উল্টোদিকে লাইনের ওপারে সেই পুকুর আর পুকুর-পাড়ের আমবাগান ঠিক তেমনই আছে। আর ওদিকে ফাঁকা মাঠের উঁচু ডাঙ্গার উপরে যে নিঃসঙ্গ শিমুলগাছটি দাঁড়িয়েছিল এখনও তেমনিই আছে। এই বসন্তে বিশাল শিমুল তার প্রসারিত শাখাপ্রশাখায় অজস্র টকটকে লাল ফুলের রক্তিমবেদনায় যেন ঘননীল আকাশকেও বেদনাময় করে তুলেছে।

উনি প্লাটফর্মের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ঢালু দিয়ে নেমে মাঠের উপরের পায়ে-চলা পথরেখা দেখতে পেলেন। এই পথ ধরেই হাঁটতে লাগলেন উনি। তাকিয়ে দেখলেন, সামনে সমৃদ্ধ গ্রামটির উঁচু নিচু অট্টালিকা, খড়ের চাল, নারকেল তাল আর সবুজ বনস্পতিদের ঘনবদ্ধ রূপ মধ্যাহ্ন রৌদ্রে একটি অলৌকিক ছবির মতো দেখাচ্ছে। কোথায় কোকিল ডাকছে। ছাতার পাখির দলবদ্ধ ক্যাচর ম্যাচর শুনতে পেলেন। বাতাসের করুণ আওয়াজ দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হল ওঁর। তাঁর ছেলেবেলার সঙ্গী এই প্রকৃতির একটি চেনা সুগন্ধও যেন তিনি নিঃশ্বাসে অনুভব করলেন।

ওঁদের বাড়ি স্টেশন থেকে আধমাইল পথ হবে। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে পথটুকু শেষ হয়ে এল। উনি গ্রামে ঢুকে পড়লেন। কি আশ্চর্য, তাঁর গ্রামের পথঘাট ঘরবাড়ি ঠিক তেমনিই আছে! একটু বুঝি হতশ্রী মনে হচ্ছে। চালে অনেকের খড় নেই, অনেকের বাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গেছে। গ্রামের পথ এমনিতেই খাঁ খাঁ করে, এই ভর্তি দুপুরে পথঘাট একেবারে শ্মশান-শাসিত জনভূমির মতো নির্জন শান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে যেন। দিন দুপুরেও তিনি ঝিঁ ঝিঁর কানে-তালা-ধরানো ডাক শুনতে পেলেন।

তারপর কম্পিত বুকে তাঁদের দোতলা বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালেন। গোটা শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বিচিত্র স্মৃতি ও ঘটনা কলকল করে কোন শুকিয়ে যাওয়া উৎস থেকে তাঁর হৃদয়ে ঢেউ তুলে তুলে বয়ে যেতে লাগল। মাকে মনে পড়ল, মায়ের সেই হীরের নাকছাবি-পরা ঘন চুলে ঢাকা অপরূপ মুখখানি, সুন্দর স্বপ্নায়ত দুখানি চোখ যেন তাঁর সামনের নীল আকাশে ভেসে উঠল। প্রথম যৌবনের সেইসব বসন্তরাগরক্ত বেদনা ও

ও তীব্র সুখের দিনগুলি যেন তাঁর চারপাশে হাহাকার করে উঠল। ঐকতান সঙ্গীতের মতো বিচিত্র আনন্দ ও দুঃখ তাঁকে ঘিরে বেজে উঠল যেন।

মহারাজ বাইরের বারান্দায় উঠে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। থেমে থেমে কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল, একটি বয়স্ক সধবা মেয়ে (সম্ভবতঃ বাড়ির ঝি) দরজা খুলে দাঁড়াল। এক পলক মহারাজকে দেখে নিয়ে শুধোল, কাকে চান?

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষমানুষ বাড়িতে কেউ আছে?

—না, বড়বাবু অফিসে গেছে কলকাতায়, মেজবাবু কলেজে গেছে, মা আছে শুধু।

—তোমাদের মাকে একবার ডেকে দেবে? বলো, একজন ভদ্রলোক বিশেষ দরকারে দেখা করতে চাইছেন, বিশেষ দরকার।

দরজা খোলা রেখে কিন্তু বসতে না বলেই মেয়েটি চলে গেল। মহারাজ ভিতরে ঢুকে একটি চেয়ারে বসলেন।

একটু পরে মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক বিধবা মহিলা ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্থির অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মহারাজকে দেখলেন তারপর বাতাসের স্বরে বললেন, কে বীরেশ!?

তাঁর মাথার ঘোমটা খসে পড়ল।

বীরেশ বললেন, আমিই, তুমি চিনতে পেরেছ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

—চিনতে পারা আমার উচিত ছিল না, কিন্তু না চিনে পারব কি করে! ও মুখ যে আমার পাথরপ্রাণে খোদাই হয়ে আছে।

থর থর করে তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, বললেন, বীরেশ, তুমি এমন করে আমাকে চমকে দিয়েছ, আমি সইতে পারছি না।

বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

বীরেশমহারাজ বিধবা মহিলাটিকে দুচোখ ভরে দেখছিলেন। বয়স হয়তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে, পরণে থান কাপড়, মাথায় কাঁচাপাকা ঘন চুলের মাঝখানে শূন্য সাদা সিঁথির হাহাকার। দুটি হাত গলা সবই খাঁ খাঁ করছে। তবু সেই কিশোরীকে যেন আজও চেনা যায়। সেই ছোটো কপাল, লীলায়িত ভুরুর নীচে মদিরা-মাখানো দুটি চোখ, সেই বাঁশীর মতো নাক, সরু সরু দুটি ঠোঁট যেন ফুলের নির্যাসে ভিজে।

মহারাজ বললেন, আমি তোমাকে কি বলে ডাকব বলে দাও।

মহিলা বললেন, আর যাই বলে ডাকো না কেন, 'মা' যেন বলো না, তাহলে আমি আত্মঘাতী হব। এখন তো আর কেউ নেই তুমি না হয় আমার নাম ধরেই ডাকো তাতে অপরাধ কিছু হবে না।

মহারাজ বললেন, নাম ধরে? তাই ডাকি, তাতে, পাপ যদি কিছু করে থাকি, জানিনা আমি, আমার পাপের ভারা আর কতটুকু বাড়বে!

তারপর বললেন, মাধুরী, তুমি কেমন আছ!

মাধুরী বললেন, কেমন আছি, কেমন ছিলাম, আমি জানিনা বীরেশ!

তারপর বললেন, ওমা, আমি কেমন মানুষ দেখো, তোমাকে এখনও বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি, এ বাড়ির মালিক, এ বাড়ির রাজা যে সে এখনো বসে রইল বাইরে! ওঠো, চলো উপরে চলো, আমার ঘরে গিয়ে বসবে।

মহারাজ প্রতিবাদ করলেন না, বাড়ির ভিতরটাও দেখবার জন্যে আকুল কোনো তৃষ্ণা তিনি অনুভব করছিলেন। মাধুরীর সঙ্গে তিনি ভিতরে ঢুকলেন, নীচের তলাটা, উঠোন ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

মাধুরী পা ধোবার জল আর গামছা নিয়ে এসে বললেন, আমি পা ধুয়ে মুছে দিই? তুমি তো সন্ন্যাসী!

—না, আমি আর সন্ন্যাসী নই।

তিনি নিজেই পা ধুয়ে নিলেন। তারপর মাধুরীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যে ঘরে তিনি কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন সেই ঘরটি প্রথমে দেখে তাঁর মা-বাবার ঘর এখন মাধুরীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মাধুরী বললেন, খাটে বস্নো, ভালো করে পা তুলে বসো।

—তুমিও বসো।

—তোমার খাবার নিয়ে আসি।

—থাক সে পরে হবে, আমার খিদেও নেই।

মাধুরী মেঝেতে মাদুর পেতে বিনীত ভঙ্গীতে বসলেন তারপর বললেন, তুমি কেন বললে তুমি সন্ন্যাসী নও?

মহারাজ বললেন, মাধুরী, আমি গত ক'দিন হল সন্ন্যাস আর গৈরিক ত্যাগ করেছি, স্বেচ্ছায়। কেননা সন্ন্যাসী থাকা আমার আর উচিত ছিল না।

—কেন এমন কথা বলছ এতদিন পরে?

মহারাজ বললেন, মাধুরী, আমি কেন সন্ন্যাস নিয়েছিলাম তুমি জানো?

—জানি।

—কেন বলো দেখি।

—তুমি আমাকে বড় গভীরভাবে ভালোবেসেছিলে। এই তো কটা বাড়ির পরেই আমাদের বাড়ি। দিনেরাতে কতবার যে দেখা হয়েছে, কত কথা, কত হাসি গল্প! সে সব দিনের কথা মনে হলে আমার আজও গা শিউরে ওঠে। এই দেখো আমার হাতে কাঁটা দিয়ে উঠেছে!

বলে হাত বাড়িয়ে সুন্দর হাত বীরেশকে দেখালেন মাধুরী।

আবার বললেন, তুমি তখন কলকাতার কলেজে বি. এসসি. পড়ছিলে, কলেজ-হোস্টেলে থাকতে, তুমি শুধু-আমাকে বলেছিলে তুমি স্বদেশী করো, একবার বাড়ি এসে আমাকে বলে গেলে 'আমরা স্বামীস্ত্রী হবই,' সেবার তুমি কলকাতা চলে যাবার সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম, তোমার মনে আছে?!

—সবই মনে আছে মাধুরী। সেবার কলকাতা গিয়ে আমি ফিরে আসতে পারিনি। আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম। জেল হয়ে গেল। যেন আমি হারিয়ে গেলাম। তোমার কথাও হয়তো সেই উত্তেজনা-আবেগের মাথায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার এই দেশের প্রতি সত্যিকার কোনো ভালোবাসা হয়তো ছিল। তোমার চেয়েও দেশকে আমার বড় মনে হয়েছিল। মূর্খ আমি, বুঝি নি যে তোমাদের নিয়েই দেশ।

মাধুরী বললেন, তোমার কোনো খবর এল না। বছর ঘুরে গেল, দুবছর চলে গেল। তোমার বাবা হঠাৎ আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন। জমিদার ছিলে তোমরা, আমার মা-বাবাতো আহ্লাদে নেচে উঠল। কিছুতেই বিয়ে ঠেকাতে পারলাম না।

একটু থেমে বললেন, কিন্তু মজার ব্যাপার দেখো, বিয়ের পর মাসখানেক না যেতেই তুমি বাড়ি এলে, যেন ঝড়-খাওয়া পাখি, কচিমুখে দাড়ির জঙ্গল, উস্কোখুস্কো চুল, কতদিন তেল পড়ে নি, চোখ দুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। আর আমাকে দেখেই তুমি পাথর হয়ে গেলে, আর আমার কথা তোমাকে কি করে বলব, তুমি যদি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসে থাক তাহলে তা মর্মে মর্মে বুঝেছ, আমার জন্যে তোমার দয়া হয় নি বীরেশ?!

বীরেশ মহারাজ বললেন, দয়া? তোমার জন্মেই হয়তো আমি বাড়ি

ছেড়েছিলাম, হয়তো তোমাকে লজ্জা থেকে চিরদিনের জন্যে বাঁচাতেই আমি পালিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, ঠিক সেইদিন রাত্রেই তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছিলে। তোমার বাবা তাতে দুঃখ পেয়েছিলেন, তুমি ছিলে তাঁর একমাত্র ছেলে, তবু তিনিও হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন, কেননা তোমার চোখের সামনে কিশোরী বউকে নিয়ে তাঁরও লজ্জা ছিল।

মহারাজ বললেন, হ্যাঁ, বাবা খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন।

মাধুরী বললেন, তারপর কয়েকবছর পরে একখানা দলিল এল তোমাদের মঠ থেকে, তুমি সম্পত্তির সমস্ত দাবী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছ।

হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর কোনো পিছুটান, কোনো সম্পত্তির অধিকার থাকতে নেই।

মাধুরী বললেন, তুমি আমাকে তোমার বাবার স্ত্রী হতে দেখেই হয়তো অভিমানে বেদনায় সন্ন্যাস নিয়েছিলে তাই না ?

—হ্যাঁ, তবে আরও কিছু কারণ ছিল, আমার দেশকেও আমি ভালো-বেসেছিলাম মাধুরী, দেশের জন্যে কিছু করতে পারব ভেবেও সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। কিন্তু দেশের জন্যে কিছু করতে পারি নি মাধুরী। সন্ন্যাসীরা হয়তো তা পারেও না। সন্ন্যাসী হওয়া মানেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, সে সমাজের কি বুঝবে ?

একটু চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন, মাধুরী, তোমার কাছে আমি একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, না হলে তোমার সঙ্গে দেখা করে পুরোনো বেদনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার বিলাস আমার ছিল না। তোমাকে দেখবার ভীষণ লোভ কতবার আমাকে কাতর করেছে, বাবার মৃত্যু সংবাদ জেনেছিলাম, তারপর অনেকবার ভেবেছি তোমাকে চিঠি লিখি, আমাকে একবার দেখা দিয়ে যাও।

—আমারও কতবার ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে দেখে আসি, কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী, পাছে তোমার মর্যাদা নষ্ট হয় তাই যেতে পারি নি। জানতাম মৃত্যুর আগে তোমার দেখা একবার পাবই। কিন্তু বলো তুমি কি চাও, প্রার্থনা কেন বলছ, এ সবই তো তোমার বীরেশ, তুমি এখানেই থাকো, কোথায় আর যাবে, আমরা সকলেই বড় সুখী হব।

মহারাজ বললেন, না, তা হয় না, আমি তোমার কাছে কিছু টাকা ধার চাইতে এসেছি। পরে পাঠিয়ে দোব।

—না, তোমার যত টাকা দরকার সব নিতে হবে, ধার নয়, এ তোমার ন্যায্য পাওনা।

—না, তা হবে না, তাহলে আমি কিছুই নোব না, ওতে আমাকে ছোট করা হবে মাধুরী।

—বেশ, তবে তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে।

—আমি ক'দিন হল আশ্রম থেকে চলে এসেছি। নিজের বলতে কিছু নেই। কাজ টাজ জুটে গেলে ধীরে সুস্থে টাকা তোমাকে পাঠিয়ে দোব। তুমি, আপাততঃ, আমাকে হাজারখানেক টাকা দিলেই হবে।

মাধুরী বললেন, হাজার টাকাই এখন আমার কাছে আছে, ধান বিক্রির সব টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি, সংসার খরচের জন্যে ঐ টাকাই রেখেছিলাম, না হলে তোমার পেতে ক'দিন দেরি হত।

মাধুরী ঘরের কোণের লোহার সিন্দুক খুলে দশখানা একশ টাকার নোট নিয়ে এসে মহারাজের হাতে দিলেন।

তারপর বললেন, তুমি একটু বসো, আমি জলখাবার নিয়ে আসি। তোমাকে কিছু খাওয়াতে না পারলে আমার আফসোসের সীমা থাকবে না।

মাধুরী রুপোর রেকাবিতে জল-খাবার নিয়ে এলেন, রুপোর গেলাসে জল। ঘরের মেঝেতে জল ছিটিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে সুন্দর আসন পেতে দিলেন। মহারাজ আসনে বসলে বললেন, তুমি খাও, আমি আরও একটু কথা বলি।

তারপর বললেন, আমার দুই ছেলে জানো তো তুমি?

—যে মেয়ে দরজা খুলে দিল তার কাছেই জানলাম। বড়ছেলে চাকরি করছে, ছোটছেলে কলেজে পড়ে।

—হ্যাঁ, এবার বড়টার বিয়ে দোব ভাবছি, বিয়েতে তুমি আসবে?

—আমার আসা ঠিক হবে না মাধুরী। আমি যে সন্ন্যাস ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, এ কথাও ছেলেদের ব'লো না।

—তুমি কি সন্ন্যাস ছেড়ে লজ্জা পেয়েছ?

—লজ্জা পাই নি। কিন্তু আমার কথা কেউ ঠিক বুঝবে না, তোমরা আমার আত্মীয়, আমার এ পরিচয় দিলে সমাজের চোখে তোমরা ছোট হয়ে যাবে।

—সমাজের কথা থাক, আমার কথাই আমার কাছে বড়।

—না মাধুরী, সমাজও তুচ্ছ নয়।

খাওয়া শেষ হলে মহারাজ বললেন, মাধুরী, এবার আমি যাব। জানি না, আমার মৃত্যুর আগে হয়তো আর একবার দেখতে চাইব, দেখা হবে কিনা তাও জানি না।

মাধুরী মহারাজের সঙ্গে বাইরের ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন। মহারাজ মাধুরীর দিকে তাকালেন। মাধুরী কাঁদছিলেন, বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিও, ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেবার অনুমতি দিও, সারাজীবন মনের আগুনে জ্বলেছি, শেষ কটা বছর যদি একটু শান্তিতে থাকি কার কি ক্ষতি বলো!

—তাই হবে মাধুরী।

বলে মহারাজ রাস্তায় নেমে গেলেন।

মাধুরী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মহারাজের চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

(৬)

—মহারাজ, ভিতরে আসব?

—এসো অনিরুদ্ধ, আমি তোমার জন্যেই বসে আছি।

অনিরুদ্ধ পর্দা ঠেলে বীরেশ মহারাজের হোটেলের ঘরে এসে ঢুকল।

মহারাজ বললেন, আমি তোমার জন্যে একেবারে রেডি হয়ে বসে আছি। হোটেলের বিল মেটানো হয়ে গেছে। এখন বেরিয়ে পড়লেই হয়।

অনিরুদ্ধ দেখল, মহারাজ সাইডব্যাগে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগ-কাঁধেই বসে আছেন। আর মহারাজ দেখলেন, অনিরুদ্ধ আজ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছে! ঝক্‌ঝক্‌ করছে লাবণ্যময় পবিত্র উজ্জ্বল মুখ! পরণে শান্তিপুরী দামী ধুতি সুন্দর কোঁচা করে পরা, গায়ে দামী গরদের পাঞ্জাবি। পায়ে নক্সা-করা সুন্দর স্যাণ্ডেল। ওঁর মনে হল, এমন রূপবান যৌবনকে এমনি সুন্দর করেই সাজানো উচিত।

মহারাজ বললেন, আজ দেখি তুমি দেশী পোশাক পরেছ। বাঃ, কি সুন্দর লাগছে!

অনিরুদ্ধ বলল, মা বলে, দিনরাত কি তোদের সাহেবী পোশাক পরা, বাঙালীর ধুতি-পাঞ্জাবী পরাও অভ্যাস করা উচিত।

অনিরুদ্ধ বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এগারোটা বাজে, আমি ট্যাক্সি নিয়েই এসেছি, নীচে দাঁড়িয়ে আছে, চলুন তাহলে।

—চলো।

বলে মহারাজ উঠলেন। নীচে নেমে এসে দুজনে ট্যাক্সিতে উঠলেন।

মহারাজ বললেন, হাওড়া স্টেশন চলো।

অনিরুদ্ধ অবাক হল।

দুজনে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন। অনিরুদ্ধ প্লাটফর্ম-টিকিট কিনে আনল। দুজনে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। ট্রেন আসতে বেশি দেরি ছিল না। প্লাটফর্মে একটা বেঞ্চে বসলেন দুজনে। অনিরুদ্ধর জানতে ইচ্ছে হল, কার জন্যে মহারাজ স্টেশনে অপেক্ষা করছেন, ট্রেনে কে আসবে। কিন্তু ও কৌতূহল দমন করে বসে রইল।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, অনিরুদ্ধ, তোমার বাড়িতে কোনো অসুবিধা নেই তো?

—আজ্ঞে না। মা খুশি মনে সম্মতি দিয়েছেন, বলছিলেন সেইদিনই আপনাকে নিয়ে যেতে।

ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকে পড়েছিল। দুজনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

জনস্রোত বয়ে চলতে লাগল। ক্রমশঃ প্লাটফর্ম প্রায় ফাঁকা হয়ে এল।

মহারাজ বললেন, চলো একটু আগিয়ে গিয়ে দেখি।

দুজনে ট্রেনের গা ঘেঁসে আগিয়ে চললেন। মাঝামাঝি গিয়ে মহারাজ দেখলেন শুক্তি একটি চামড়ার সুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তিত ক্লান্ত মুখ।

মহারাজ আগিয়ে গিয়ে বললেন, এসে পড়েছ, আমি খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম, চিঠি পেলে কিনা, আসতে পারবে কিনা।

—চিঠি ঠিকসময়েই পেয়েছি।

—আমি চারদিন আগে চিঠি দিয়েছি। বাড়ির ব্যবস্থা হতেই চিঠি লিখেছি।

মহারাজ অনিরুদ্ধকে দেখিয়ে বললেন, শুক্তি, এ অনিরুদ্ধ রায়, তোমার আশ্রমে আসবার আগে ও কিছুদিন ওখানে শিক্ষকতা করেছিল। খুব ভালো ছাত্র ছিল। ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এখন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

আর অনিরুদ্ধ এ হচ্ছে শুক্তি সেন।

অনিরুদ্ধ হাত জোড় করে নমস্কার জানাল, শুক্তি সুটকেশ নামিয়ে প্রতি-নমস্কার করল। পরস্পরের চোখে চোখ পড়ে গেল। অনিরুদ্ধের অপাপবিদ্ধ নীল আকাশের মতো হৃদয়ে ডমরুধ্বনিতে মেঘ জেগে উঠল, বিদ্যুৎ ঝলসিত হল শত শাখায়। আর শুক্তির মনে হল, ও যেন হঠাৎ জেগে উঠল। ওর মৃত হৃদয় যেন প্রাণ পেয়ে দুলে উঠল। হঠাৎ কোন অদ্ভুত আনন্দে ওর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল।

মহারাজ বললেন, চলো তাহলে যাওয়া যাক।

অনিরুদ্ধ শুক্তির সুটকেশটা হাতে তুলে নিল।

শুক্তি বলল, কেন? আমি নিই।

অনিরুদ্ধ বলল, তা কেমন করে হয়? আপনি সুটকেশ বইবেন আর আমি কোঁচা দুলিয়ে সঙ্গে যাব? বেশ বললেন কিন্তু।

মহারাজ হেসে বললেন, তবু বলতে হয়।

তিনজনে গেট পেরিয়ে গেলেন।

অনিরুদ্ধ শুক্তিকে বলল, আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?

শুক্তি বলল, ওমা, না, না।

—অন্তত একটু চা খাবেন চলুন, আপনাকে খুব শ্রান্ত দেখাচ্ছে।

অতএব তিনজনে স্টেশনের রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলেন। একটি টেবিল ঘিরে তিনজনে বসলেন।

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ আমি চা খাব না, তোমরা খাও।

শুক্তি বলল, আমি কিন্তু শুধুই চা খাব।

অনিরুদ্ধ যেন হতাশ হয়ে বলল, কেন আপনার তো খিদে পেয়েছে, মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তাহলে শুধুই চা খাবেন কেন?

শুক্তি ঠোঁট ছড়িয়ে সুন্দর দাঁতের আলোয় অনিরুদ্ধকে মুগ্ধ করে বলল, সত্যি কিছু খেতে এখন ইচ্ছে করছে না।

মহারাজ হঠাৎ বললেন, অনিরুদ্ধ ওকে তুমি 'তুমি' বলেই কথা বলো, ও তোমার চেয়ে বয়েসে তো ছোটো।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পারল না, কেন মহারাজ হঠাৎ একথা বললেন। মহারাজকে ক্রমেই ওর ভারি রহস্যময় মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ-আনন্দিত আত্মবিস্মৃত শুক্তি ওর পাথর-চাপা প্রাণে যেন হঠাৎ-খুশির আলো পেয়ে বলে বসল, তাহলে কিন্তু আমিও ওকে 'তুমি' বলব।

আর সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ হয়ে নিজেকে সংশোধন করে বলল, আমি বাবা মাস্টারি করি, আমাকে 'তুমি' বললে আমি 'আপনি' বলতে পারব না।

অনিরুদ্ধ বলল, ঠিক আছে, মহারাজ অকারণে কিছু বলেন না, উনি যখন বলেছেন তখন তুমিই বলি। তুমি এখন তাহলে শুধুই চা খাবে কেমন ?

শুক্তি হাসি হাসি মুখ করে বলল, হ্যাঁ, শুধু চা।

চা খাওয়া হলে ওঁরা বাইরে এসে ট্যাক্সি নিলেন। পিছনের সিটে প্রথমে শুক্তি তারপর মহারাজ। অনিরুদ্ধ সামনে ড্রাইভারের পাশে বসতে গেল, মহারাজ বললেন, না, না, তুমি আমার পাশে বসো।

ট্যাক্সি যখন হাওড়া ব্রিজে ঢুকছিল তখন মহারাজ বললেন, এখন তাহলে সোজা তোমাদের বাড়ি যাব তো ?

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ কিছু যদি না মনে করেন তাহলে কথাটা বলি।

—বলো, মনে করব কেন ?

—ইনিই কি—?

—হ্যাঁ, তুমি এখনও তা বুঝতে পার নি ?

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, আমার মা খুব বুদ্ধিমতী বিবেচক মহিলা। তিনি একটা কথা বলে দিয়েছিলেন আমাকে।

—কি কথা ?

—বলেছেন, দেরি না করে কালীঘাটে বিয়ে সেরে যেন আপনারা মায়ের অতিথি হন।

মহারাজ গম্ভীর চিন্তিত নীরব হয়ে গেলেন। শুক্তির মুখ বিবর্ণ হল।

অনিরুদ্ধ ড্রাইভারকে বলল, কালীঘাটের মন্দিরে চলো।

তিন জনেই এরপর নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। ট্যাক্সি কোনো বাধা না পেয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

কালীঘাটের মন্দিরের গেটের বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই পাণ্ডারা যেন

ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনিরুদ্ধ ব্যাপারটা বলতেই পাণ্ডা যেন ওদের টানতে টানতে মন্দির সংলগ্ন তার বাড়ির একখানা ঘরে নিয়ে গেল। দ্রুত কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

পাণ্ডা শুক্তিকে বলল, বসুন মা!

শুক্তি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে যেন ভাগ্যের গলাধাক্কায় পিঁড়িতে গিয়ে বসল।

পুরোহিত অনিরুদ্ধকে বলল, আপনি আসুন।

অনিরুদ্ধ মহারাজের হাত ধরে পিঁড়িতে বসিয়ে দিল।

বিয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রদীপ জ্বলতে লাগল, ধূপ পুড়ছে, মালা চন্দন ফুল সিঁদুর পাশেই সাজানো। পুরোহিত দুর্বোধ্য উচ্চারণে মন্ত্র বলে যেতে লাগল। মহারাজের হাতে শুক্তির হাত রাখল। শুক্তির নিশ্চল হাত মহারাজের বিশাল থাবার মধ্যে কেঁপে উঠল, ঠাণ্ডা হিম সেই হাত মহারাজের শরীর যেন কাঁপিয়ে দিল। পুরোহিত মালা বদল করাল। তারপর একখান সিঁদুরের মোড়ক খুলে মহারাজের হাতে দিয়ে বলল, 'দিন, কনের সিঁথিতে ঢেলে দিন।' কম্পিত হাতে মহারাজ সিঁদুর ঢেলে দিলেন।

পুরোহিত বলল, এই নিন মায়ের প্রসাদী শাঁখা আর নোয়া পরিয়ে দিন, এ অক্ষয় শাঁখা, অক্ষয় নোয়া।

মহারাজ শাঁখা নোহা পরাতে পারছিলেন না। পুরোহিত নিজেই তা পরিয়ে দিল।

পুরোহিত দক্ষিণা ইত্যাদি চাইলে অনিরুদ্ধ ওর পকেট থেকে দিতে গেল।

মহারাজ বললেন, আমি দিচ্ছি।

—থাক পরে দেবেন।

বলে পুরোহিতকে টাকা মিটিয়ে দিল অনিরুদ্ধ।

যেন ঝড়ের বেগে কোনো বিরক্তিকর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়ে গেল। শ্মশানের চাঁড়ালের মতো পুরোহিত তার পাওনা বুঝে পেয়ে উদাসীন হয়ে গেল, বলল, যান, মাকে দর্শন করে ঘরে চলে যান, মায়ের মন্দিরে এই বিবাহ শ্রেষ্ঠ বিবাহ।

মহারাজ আর শুক্তি একে একে গলার মালা খুলে সেইখানেই রেখে দিলেন।

তারপর ওঁরা তিনজনে ঘর থেকে বাইরে এলেন।

মহারাজ বললেন, তোমরা যাবে নাকি মাকে দর্শন করতে?

শুক্তি বলল, আমি এইখান থেকেই মাকে প্রণাম করছি।

অনিরুদ্ধ কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাজ মন্দিরে গেলেন মাকে দর্শন করতে। সেই ধবক ধবকে প্রদীপ-জ্বালা প্রায়ান্ধকার পাতালগৃহে ভয়ঙ্করী মায়ের বিশাল ভীষণ মুখ, মায়ের অদ্ভুত চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নথপরা নাক, লোল জিহ্বা, শাণিত খাঁড়া আর ছিন্ন-মুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজ যেন স্বস্তি বোধ করলেন।

তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, অনিরুদ্ধ আর শুক্তি কাঠের পুতুলের মতো বিবর্ণমুখে তেমনিই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুক্তির আলুলায়িত রুক্ষ চুলের উপরে সিঁদুরের রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছে।

মন্দিরের বাইরে এলেন ওঁরা। অনিরুদ্ধ ট্যাক্সি ডেকে আনল। তিনজনে তেমনিভাবেই পিছনের সিটে বসলেন। মহারাজ মাঝখানে, বাঁদিকে শুক্তি, ডাইনে অনিরুদ্ধ। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, এমনি করে চুপ করে থাকার প্রতিযোগিতা করলে চলবে না। আজ আমি আপনাদের গার্জেনের মতো। আজ আমি যা বলব তাই করতে হবে। আমি বাড়ি গিয়ে আনন্দ করতে চাই। আমরা ফুল কিনব, গয়না কিনব, নতুন নতুন কাপড় কিনব, খাবার কিনব। এবং আনন্দ করব।

অনিরুদ্ধের কথা বলার ভঙ্গিতে শুক্তি হঠাৎ ফিক্ করে হেসে উঠল।

শুক্তির হাসি শুনে মহারাজ যেন বেঁচে গেলেন, তিনি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লেন।

অনিরুদ্ধ ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, নিউ মার্কেটে চলুন ফুল কিনব, আপনাকে আমরা শীঘ্রি ছাড়ছি না কিন্তু।

নিউ মার্কেটে ফুলের দোকানে গিয়ে অনিরুদ্ধ অজস্র গোলাপ, রজনীগন্ধা আর চাঁপা ফুল নিল, একগাছি যুঁইফুলের আর একগাছি রজনীগন্ধার গড়ে মালা নিল।

মহারাজ বললেন, অত ফুল নিয়ে কি হবে?

অনিরুদ্ধ বলল, চুপ করুন তো, আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

মহারাজ মানিব্যাগ খুলে দাম দিতে গেলেন।

অনিরুদ্ধ বলল, না, ফুলের দাম আমি দোব।

ফুল কিনে ট্যাক্সিতে উঠে অনিরুদ্ধ ওঁদের নিয়ে গেল কাপড়ের দোকানে। মহারাজের কথা অগ্রাহ্য করে নিজেই শুক্তির জন্যে শাড়ি পছন্দ করল, মহারাজের জন্যে ভালো তাঁতের ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি কিনল। এবার মহারাজই টাকা দিলেন। পথে ট্যাক্সি থামিয়ে মহারাজের একজোড়া ব্রাউন রঙের নিউকাট সু কিনে নিল অনিরুদ্ধ, তারপর গেল গয়নার দোকানে।

মহারাজ বললেন, কি করছ অনিরুদ্ধ, এভাবে আমি টাকা খরচ করতে পারিনা এখন।

অনিরুদ্ধ কোনো কথা শুনতে চাইল না, বলল, আমি ওকে একটা আংটি উপহার দোব। আপনি আমার পরিচিত, আজ বিয়ের দিনে আমিই অতিথি, আমিই নিমন্ত্রিত, আমি যদি ওকে কিছু উপহার না দিই তাহলে ওর রাগ করা উচিত।

দোকানের সামনে গিয়ে ট্যাক্সি থামলে মহারাজ বললেন, আমার বড় ক্লান্তি লাগছে অনিরুদ্ধ, তোমরা গিয়ে পছন্দ করে নিয়ে এসো।

অগত্যা অনিরুদ্ধ শুক্তিকে নিয়ে এয়ার কণ্ডিসনড্ অভিজাত দোকানটিতে ঢুকে পড়ল, বহু দেখেশুনে একটি হীরে বসানো সুন্দর আংটি পছন্দ করল, জিজ্ঞেস করল, কি, তোমার পছন্দ হচ্ছে?

শুক্তি বলল, খুব সুন্দর, এত সুন্দর আংটি আমি কখনো দেখি নি।

—বাস তাহলেই হল।

আংটি নিয়ে বলল, পরে নাও।

শুক্তি হঠাৎ বলে ফেলল, তুমি পরিয়ে দাও!

অনিরুদ্ধ একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, ওর মনে হল মহাকালের চিরচঞ্চল গতিও বুঝি থেমে গেছে। তারপর দ্বিধা না করে ওর অনামিকায় সেই আংটি পরিয়ে দিল।

গোধূলি বেলায় অনিরুদ্ধের বাড়ির দরজায় ট্যাক্সি এসে থামল। অনিরুদ্ধ আগে নেমে গিয়ে দরজার কলিং বেল বাজাল। দরজা খুলে দিলেন ওর মা।

অনিরুদ্ধ বলল, মা ওঁরা এসে গেছেন।

—নিয়ে এসো!

ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল অনিরুদ্ধ। মহারাজ আর শুক্তি নেমে এলেন।

অনিরুদ্ধ বলল, আপনারা ভেতরে যান, আমি সব নিয়ে যাচ্ছি।

মহারাজ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে পা দিলেন, পিছনে

লজ্জানত শুক্তি দ্বিধা জড়িত পায়ে অগ্রসর হল।

অনিরুদ্ধ শুক্তির সুটকেশ, ফুলের ঝুড়ি, জামাকাপড়ের প্যাকেট, জুতোর বাক্স নিয়ে ভিতরে এল। মা বলছিলেন, আসুন আসুন, আমি কখন থেকে ভাবছি এত দেরি কেন হবে, আবার মনে হল, অনিরুদ্ধ সঙ্গে আছে দেরি না হয়েই যায় না।

মা দরজা বন্ধ করলেন। ওঁদের সঙ্গে নিয়ে বাইরের ঘর থেকে ভিতরের বারান্দায় এসে বললেন, উপরে চলুন।

মহারাজ অনিরুদ্ধের মাকে দেখছিলেন, বছর পঞ্চাশ বয়স হয়েছে। মাথার চুল প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে। অনিরুদ্ধের মধ্যে যে কমনীয় লাবণ্য চোখে পড়ে এই মহিলার কাছ থেকেই তা ও পেয়েছে। শান্ত, স্নিগ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, সুন্দর দুটি চোখ, পরণে সরুপাড় শাড়ি, দুহাতে দুগাছি চুড়ি, বৈধব্যও মহিমময় মনে হচ্ছে।

মহারাজ বললেন, মা, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কোন ঘরে আমি থাকব একটু দেখিয়ে দিন, আমি এখন একটু শুয়ে থাকতে চাই।

মা বললেন, আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন।

বলে বারান্দার শেষ ঘরখানিতে ওদের নিয়ে গেলেন। সমস্ত ঘরটি যে সদ্য ঝাড়ামোছা করা হয়েছে তা বোঝা যায়। মেঝেতে বিশাল এক পদ্মের আল্পনা। একখানি নতুন খাটে পুরু বিছানায় সুন্দর বেডকভার পাতা। জানলায় দরজায় নতুন পর্দা। ওদিকে লম্বা এক সোফা, সামনে ছোট নিচু টেবিল। একধারে নতুন ছোট আলনা। দেওয়ালে এক ঝকঝকে বড় আরশি টাঙানো। ঘরের এককোণে আল্পনা-আঁকা একটি কলসী। নিয়নের আলোয় সবই বড় সুন্দর লাগছে। মহারাজ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিছানায় বসে বড় গভীর স্বস্তি অনুভব করলেন।

অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকে বিছানার উপরে জিনিসগুলি রাখল।

অনিরুদ্ধের মা ফ্যান খুলে দিয়ে শুক্তিকে বললেন, তুমি বসো মা।

শুক্তি নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করল।

মা শুক্তির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, থাক থাক বসো তুমি।

শুক্তি গিয়ে সোফাতে বসল। মা শুক্তিকে ভালো করে দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন।

মা বললেন, মহারাজ, আপনারা একটু বিশ্রাম করে নিন। তারপরে

চান করে খাওয়া-দাওয়া করবেন। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাদের। আমি এখন যাই তাহলে।

বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, অনিরুদ্ধ ওঁর সঙ্গেই চলে গেল।

ওঁরা চলে গেলে ঘরের মধ্যে গভীর স্তব্ধতা রুদ্ধ হয়ে রইল। শুধু ফ্যানের বাতাস-কাটা একটানা শব্দ সেই স্তব্ধতাকে যেন আরও গাঢ় করে তুলছিল।

মহারাজ শুয়েছিলেন, অনেকক্ষণ পরে উঠে বসে বললেন, শুক্তি তুমি কি ভাবছ।

শুক্তি চোখ না তুলেই অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল, কি ভাবছি জানি না মহারাজ!

মহারাজ বললেন, আমি চলে আসাতে আশ্রমে কি কোনো আন্দোলন হয়েছে?

—না, তেমন কিছুই হয় নি, হয়তো হোমানন্দ স্বামী কিছুই বলেন নি, আপনি কিছুদিন কোথাও গিয়েছেন, এমনি সকলের ধারণা।

—তুমি কি রেজিগনেশন দিয়ে এসেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তো তাইই বলেছিলেন। তাছাড়া আর সেখানে কেমন করে ফিরে যেতাম! হোমানন্দজীর সামনে কি করে দাঁড়াতাম!

মহারাজ বললেন, শুক্তি তুমি কি ভয় পেয়েছ?

—না মহারাজ ভয় কি? আপনি তো আছেন।

আচমকা মহারাজ বললেন, আমাকে 'তুমি' করেই কথা বলো শুক্তি।

শুক্তি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে মনে হয়তো 'তুমি' বলে দেখল কেমন তা লাগে। তারপর রক্তের ঝাঁঝে রাঙা মুখখানি নত করে বড় দীন ভাবে বলল, মহারাজ, 'তুমি' করে আপনাকে কথা বলতে অনুরোধ করবেন না। আমি তা পারব না। আপনাকে 'তুমি' বললে নিজের কাছে আপনাকে আমি বড় ছোট করে ফেলব।

মহারাজ কথা বললেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

অনিরুদ্ধের গলা শোনা গেল, মহারাজ ভেতরে আসব?

—এসো এসো।

অনিরুদ্ধ ঘরে এল, পরণে হলুদ রঙের লুঙ্গি আর গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। সিংহের মতো সরু কোমর আর চওড়া বুক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুক্তি ওকে অবাক হয়ে দেখছে দেখে লজ্জা পেয়ে বলল, আরে পাঞ্জাবিটা পরে আসতে

ভুলে গেলাম। ভারি অন্যায় হয়েছে তো।

মহারাজ বললেন, ঠিক আছে, কোনো অন্যায় হয়নি, অত ফর্মালিটির দরকার নেই।

অনিরুদ্ধ সবে গা ধুয়ে এসেছে, কপালের চুলে জল চিক চিক করছে, সাবান-ধোয়া মুখ ধবধব করছে।

শুক্তি হঠাৎ বলে ফেলল, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ!

মহারাজ হেসে বললেন, শ্রীরাধাকে ঘরে রাখা দায় হবে। তার তো কৃষ্ণের কাছে যাওয়াই উচিত।

অনিরুদ্ধ কথা চাপা দিতে বলল, মহারাজ, এবার আপনারা চান-টান করে নিন, মা তাগাদা দিচ্ছে।

মহারাজ বললেন, নীচের চানঘরে আমি যাই। তুমি শুক্তিকে নিয়ে উপরে যাও।

মহারাজ উঠে জামাকাপড় গামছা নিয়ে বাথরুমে গেলেন। শুক্তি তখনও গম্ভীর হয়ে বসেছিল।

অনিরুদ্ধ বলল, চলো, উপরে গিয়ে চান করে নেবে।

শুক্তি বলল, আচ্ছা, তুমি কি আজানুলম্বিত-বাহু, অত মোটা শক্ত-সামর্থ্য হাতদুটো তোমার, কিন্তু অত লম্বা মনে হচ্ছে কেন?

অনিরুদ্ধ হেসে বলল, সত্যি আমার হাতদুটো না হাঁটুর নীচে গিয়ে পড়ে, কি রকম লজ্জা করে যেন!

—কই দেখি দেখি হাত দুটো নামাও দেখি।

অনিরুদ্ধ হাতদুটো নামাতে শুক্তি অবাক ও মুগ্ধ হয়ে বলল, তুমি ঠিক মহাপুরুষ, মহাপুরুষ না হলে এতবড় হাত কারও হয় না। শ্রীচৈতন্যের, গান্ধীজীর নাকি আজানুলম্বিত বাহু ছিল।

অনিরুদ্ধ শুক্তির নতুন জামাকাপড়ের প্যাকেট হাতে নিয়ে বলল, ওসব কথা থাক, এসো এখন, মা রাগ করবে না হলে।

অতএব অনিরুদ্ধকে অনুসরণ করে শুক্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেল।

সকলের চান টান হয়ে গেলে উপরে ডাইনিং টেবিলে মহারাজ, শুক্তি আর অনিরুদ্ধ খেতে বসেছিল। মা নানান আহারের আয়োজন করেছিলেন। ওরা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে খাচ্ছিল। টেবিলের একদিকে বসেছিলেন মহারাজ আর শুক্তি পাশাপাশি, অন্যদিকে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ একবার শুক্তিকে ভালো

করে দেখে নিল। চান করতে গিয়ে শুক্তি মাথার সেই সিঁদুরের ধুলট ধুয়ে এসেছে। ওকে সগুবিবাহিতা বলে মনে হচ্ছে না। পরণে নতুনকেনা দামী তাঁতের শাড়ি। ভিজে রুখু চুলে ওকে কেমন যেন দেখাচ্ছে, একটু বুঝি ও আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত। মহারাজের দিকে তাকিয়ে দেখল, মহারাজকে গরদের পাঞ্জাবিতে অন্যরকম লাগছে।

মা মহারাজকে বললেন, ভালো করে খান বাবা, আপনার খুব খিদে পেয়েছে, আমি মুখ দেখে বুঝতে পারছি।

শুক্তিকে বললেন, মা লজ্জা ক'রো না, যা লাগবে চেয়ে নিও।

অনিরুদ্ধ বলল, আমাকে কিছু বললে না?

শুক্তি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

মহারাজ বললেন, সত্যিই তো এ আপনার খুব অন্যায়।

মাও হাসলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মা মহারাজকে বললেন, বাবা চলুন আপনাদের ঘরে রেখে আসি।

মহারাজ কিছু বললেন না। মাকে অনুসরণ করে মহারাজ, শুক্তি, শেষে অনিরুদ্ধ নীচের ঘরে গেলেন।

মা বললেন, আপনারা শুয়ে পড়ুন। অনিরুদ্ধ, এখন ওঁদের আর বিরক্ত ক'রো না।

মহারাজ বললেন, না, অনিরুদ্ধ থাক, একটু পরে যাবে।

—আচ্ছা, আমি যাই তাহলে।

বলে মা চলে গেলেন।

মহারাজ বিছানাতে বসলেন, শুক্তি আবার বসল সেই সোফার একধারে।

অনিরুদ্ধ এতক্ষণে ফুলের ঝুড়ি খুলে ফুলগুলো বার করে ফেলল। রজনীগন্ধার ঝাড় ঘরের কোণের কলসীতে রাখল। বলল, মালা দুটো আপনারা পরে নিন, মহারাজ আপনি রজনীগন্ধার মালাটা পরুন।

মহারাজ বললেন, তুমিই পরিয়ে দাও আমাকে।

—আমি কেন?

—মালা তো তুমিই কিনেছ?

অনিরুদ্ধ বলল, ও পরিয়ে দিক।

শুক্তি বলল, না, না, তুমি।

অগত্যা অনিরুদ্ধ মহারাজের গলায় রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

মহারাজ বললেন, আর যুঁইয়ের গোড়ে মালাটা ওকে পরিয়ে দাও।

অনিরুদ্ধ যেন ভয় পেয়ে বলল, না, না, ও মালা তো আপনারই পরাবার কথা।

মহারাজ বললেন, কথা তো অনেক কিছুই থাকে অনিরুদ্ধ, তুমি ওকে মালা পরালেই বা ক্ষতি কি? ও কি সুন্দর নয়? সুন্দরকে মালা পরালে সুন্দরকে সম্মান করা হয়, তুমিই পরিয়ে দাও।

শুক্তি মিটি মিটি হাসছিল। হঠাৎ বলে ফেলল, তুমি না পরালে ও মালা আমার গলায় আর উঠবে না অনিরুদ্ধ, মাটিতেই ও বাসি হবে।

অনিরুদ্ধ গম্ভীর হয়ে বলল, মহারাজ, আপনিই পরিয়ে দেন।

মহারাজ বললেন, আমি পরাব না অনিরুদ্ধ, কিন্তু তোমার এত ভয় কেন বন্ধু, এত দ্বিধা কেন?

অনিরুদ্ধ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর মালাটা দুহাতে তুলে নিয়ে শুক্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শুক্তি চোখে চোখ রাখল, সে চোখে রহস্যের আলো যেন নাচছে। তারপর শুক্তির গলায় মালা পরিয়ে দিল।

মহারাজ হেসে উঠলেন, তাঁর গম্ভীর হাসি মহাকালের অট্টহাস্যের মতো মনে হল।

অনিরুদ্ধ অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, ঠিক আছে গোলাপের তোড়াগুলো দিয়ে খাটটা সাজিয়ে দিই।

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, আমার কাছে বসো।

অনিরুদ্ধ বসলে মহারাজ অনিরুদ্ধের পিঠে হাত রাখলেন, বললেন, অনিরুদ্ধ, বিয়ের পর কালরাত্রি পালন করতে হয়। আজ তো আমরা এক ঘরে থাকব না। ও আজ তোমার মার কাছে থাকবে। তাই ফুল দিয়ে আজ খাট সাজিও না।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ফুল ঈশ্বরের পুজার উপকরণ। তাছাডা ফুল দেখলে আমার শবের কথা মনে পড়ে। শবশয্যায় ফুল দেওয়া হয়। কেন মনে হয় জানো, ফুল বার্ধক্যে মৃত্যুর উপহার বলে মনে হয়, আর যৌবনে ফুলকে মনে হয় শয্যার অলঙ্কার।

মহারাজ আবার বললেন, শুক্তিকে নিয়ে তুমি উপরে যাও, সত্যিই 'কাল-

রাত্রি' পালন করতে হয়, আমার বড় ক্লান্তি লাগছে, তোমরা গেলে আমি শুয়ে পড়ব।

শুক্তি উঠে দাঁড়াল।

অনিরুদ্ধ বলল, তাহলে যাই ?

—গোলাপগুলো নিয়ে যাও।

বলে গোলাপের ঝাড়গুলি অনিরুদ্ধের হাতে তুলে দিলেন মহারাজ। শুক্তিকে বললেন, তুমি চাঁপাগুলো নাও শুক্তি।

শুক্তি আঁচল পেতে ধরল। মহারাজ শুক্তির আঁচলে ফুলগুলো তুলে দিলেন।

মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। ওরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

অনিরুদ্ধের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুক্তি বলল, এখন ঘুমোতে পারব না, আমার আজ ঘুম হবে না। জেগে থেকে মায়ের পাশে ছটফট করতে লজ্জা করবে, চলো তোমার ঘরে গিয়ে একটু কথা বলি।

দোতালায় মা ওঁর ঘরেই ছিলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধ বলল, মা, আজ ও তোমার কাছে শোবে।

—কে, শুক্তি ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—মহারাজ বললেন, আজ নাকি ওঁদের কালরাত্রি।

মা আর কথা বললেন না।

অনিরুদ্ধ বলল, আমরা এখন একটু গল্প করছি, খানিক পরে ও আসবে।

মা এবারও কিছু বললেন না। অনিরুদ্ধ সামান্য অপেক্ষা করে শুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ওর ঘরে চলে গেল।

অনিরুদ্ধের ঘরে ঢুকে শুক্তির বড় ভালো লাগল। একপাশে দেওয়াল ঘেঁসে সুন্দর নিচু খাট, উপরে ফ্যান। এদিকে বিচিত্রভাবে খুপরিকাটা ছাদ পর্যন্ত উঁচু বইয়ের র‍্যাক। একদিকে ওঅর্ডরোব। জানলা ঘেঁসে লিখবার বড় টেবিল, দুটি চেয়ার, একপাশে লম্বা সোফা। টেবিলে অনেক বই, ছোটখাটো শিল্পদ্রব্য, ছাইদানি এমনি নানান জিনিস। বিছানাতে মাথার দিকে স্তূপীকৃত বই। দেওয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা একখানি সুন্দর ছবি। ঘরের কোণে ছোটো-টেবিলের মতো মস্ত রেডিও গ্রাম।

শুক্তি বলল, গোলাপগুলো তুমিই নাও, তোমার বিছানায় রাখো।

অনিরুদ্ধ বিছানায় ফুলগুলো নামিয়ে রাখল।

শুক্তি ওর আঁচলের চাঁপাফুলগুলি অনিরুদ্ধের বিছানায় খেলাচ্ছলে ছড়িয়ে দিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

অনিরুদ্ধ বলল, বসো।

—কোথায় বসব ?

—বিছানাতে বসো, বেশি হাওয়া পাবে।

ফুলছড়ানো বিছানাতেই বসল শুক্তি।

অনিরুদ্ধ ফ্যান খুলে দিয়ে বিছানার আর একধারে বসে বলল, বলো তোমার কথা বলো।

শুক্তি অনিরুদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে, তোমার ঘর থেকে মনে হয় তুমি কবি, আমাকে তোমার কবিতা শোনাবে !

অনিরুদ্ধ বলল, আমি কবি হতে চাই, পারি কোথায় ! তোমাকে পরে আমার কবিতা শোনাব।

শুক্তি একটুখানি হেসে অনিরুদ্ধকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল, অনিরুদ্ধ, তোমার খুব আশ্চর্য লাগছে না ?

—না, আশ্চর্য আর কি ? মানে আমি তো কিছু জানতাম না।

—জানবার কিছু নেইও। আমার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই। মহারাজের করুণায় আমি খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় পেয়েছি, উচ্চশিক্ষা পেয়েছি, জীবিকা পেয়েছি ! ওঁকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। উনি না দেখলে আমি ভেসে যেতাম, শেষ হয়ে যেতাম।

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ মানুষ হিসেবে খুব বড়।

শুক্তি বলল, কিন্তু অনিরুদ্ধ, আমি এখন কি করব !

অনিরুদ্ধ শুক্তিকে দেখল, ওর কণ্ঠে সেই যুঁইয়ের মালা দুলছে, কি যে মোহিনী লাগছে ওকে ! ঘরের বাতাসে ভাসছে ফুলের চাপা গন্ধ।

অনিরুদ্ধ বলল, প্রথম প্রথম ও রকম হয়, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

শুক্তি বলল, অনিরুদ্ধ আশ্রমে আমি পাঁচবছর ছিলাম খাঁচার পাখির মতন, মহারাজের কঠিন ব্যক্তিত্বে আমি আচ্ছন্ন ছিলাম। কত গম্ভীর হওয়া যায়, কত বিনীত থাকা যায়, এই ছিল আমার প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা। তোমাকে

দেখেই আমার সেই বুকের পাষাণ-ভার যেন টলে গেল। কি যে দেখলাম, আমার মনে হল, খাঁচা আমার ভেঙ্গে গেছে।

অনিরুদ্ধ ওর বুকের মধ্যে তীব্র কোনো ব্যাকুলতা অনুভব করছিল। ও বুঝতে পারছিল ও নিজেও আচ্ছন্নতার এক ঘোরের মধ্যে আছে, কিন্তু তার স্বরূপ কি স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারছিল না। ও মহারাজ বা শুক্তিকেও বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ভীষণ কোনো অঘটন যে ঘটে গেছে তা ও অনুভব করছিল। কিন্তু এই সব অনুভূতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে ও বলল, তোমাকে একটা খবর দিই শোনো; মহারাজ আমাকে ওঁর একটা চাকরির জন্যে বলেছিলেন। আমার এক বন্ধু আছে, মস্ত শিল্পপতির ছেলে। আমি তাকে বলেছিলাম। ওরা বলেছে, মহারাজকে ওদের মাদ্রাজ-ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চম্যানেজার করে পাঠাবে। মাইনে ভালোই দেবে, ওয়েল ফারনিসড্ ফ্রি কোয়ার্টার্স দেবে। যদি টিকিট পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে কাল বা পরশু তোমাদের চলে যেতে হবে।

—মাদ্রাজে চলে যেতে হবে?

—হ্যাঁ ভালোই তো?

—ভালো, কে জানে, হয়তো ভালোই হবে।

অনিরুদ্ধ বলল, ওখানে তোমরা নিরিবিলিতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে। এতদূর থেকে কোনো কথা, কোনো সমালোচনা তোমাদের স্পর্শ করতেও পারবে না।

শুক্তি বলল, অনিরুদ্ধ তুমি তো যাবে আমাদের কাছে?

—যাব।

—আমাদের সঙ্গে?

—না, না, আমার এখন ছুটি নেই।

—তাহলে তুমি কথা দাও গ্রীষ্মের ছুটিতে তুমি নিশ্চয়ই যাবে। আমি তোমার আসার পথ চেয়ে দিন গুনব। সত্যি বলছি ওখানে আমার একটুও ভালো লাগবে না। আমি আবার খাঁচার পাখি হয়ে যাব, আর নিঃসঙ্গ গম্ভীর বিনয়ী হয়ে পাথর-চাপা দিন কাটবে আমার। মাগো, আর যে আমি পারি না।

শুক্তির চোখে জল টল টল করে উঠল।

অনিরুদ্ধ শুক্তিকে একমুহূর্ত দেখে বলল, ও সব কথা বাদ দাও, এখন গান শুনবে?

—গান ! তুমি কি গান গাইতে জানো ? তোমার গলার স্বর অমন নিটোল, ভরাট, মধুর, গান তুমি জানো আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

অনিরুদ্ধ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, আমি জানি না, তুমি জানো নিশ্চয়ই, একটা শোনাবে ?

—কতদিন যে গান গাইনি ! হয়তো ভুলে গেছি।

—গাইবে গান ?

—না, মা আছেন, কি মনে করবেন, তুমি বরং গাও।

—আমি গান জানি না, রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতাম।

—শোনাও।

—শোনো তোমার মন ভালো লাগবে।

রেকর্ড প্লেয়ারের ডালা তুলে অনিরুদ্ধ দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড চাপিয়ে দিল। একের পর এক গান বেজে চলল,

"অঙ্গে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর"

"দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ"

"আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ"

"যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি"

আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের কানে আসছিল কথা আর হাসির অস্পষ্ট রেশ, গানের সুর। আর মহারাজ তাঁর ঘরে অন্ধকারে চোখ মেলে বিনিদ্র শুয়ে থেকে শুনছিলেন দুটি উচ্ছলিত যুবক-যুবতীর উচ্ছ্বসিত হাসি আর অনুভব করছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সব গানের বেদনা।

(৭)

অনিরুদ্ধ বাঁ হাতে একটা চামড়ার সুটকেশ ঝুলিয়ে ম্যানেজারের অফিসে ঢুকল। ম্যানেজার বীরেশ মহারাজ বসে বসে ফাইল ওল্টাচ্ছিলেন আর পি. এ. কে জরুরী চিঠির ডিকটেশন দিচ্ছিলেন, গম্ভীর সুন্দর তাঁর উচ্চারণ

শুনতে পেলে অনিরুদ্ধ। মহারাজের পরণে এখন দামী প্যান্ট, গায়ে সিল্কের হাওয়াই শার্ট, মাথায় টাকের চারপাশে কাঁচাপাকা ঘন চুল ছোট করে ছাঁটা, পরিষ্কার করে কামানো মুখ।

অনিরুদ্ধকে দেখে মহারাজ হেসে উঠলেন, এসে গেছ, বাঃ, প্রতিদিন তোমার কথা ভাবি।

মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন, পি. এ. কে বললেন, তুমি চিঠিগুলো টাইপ করে ফেল, আমি এসে বাকীগুলো বলছি।

মহারাজ কাছে এসে অনিরুদ্ধের ডান হাত অকৃত্রিম স্নেহে দুহাতে ধরে বললেন, চলো।

অনিরুদ্ধকে নিয়ে গিয়ে তিনি দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন, বললেন, নীচে অফিস, উপরে ম্যানেজারের কোয়ার্টার্স।

সিঁড়ির মাথায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কলিংবেলের সুইচে হাত দিলেন। শুক্তি দরজা খুলে দাঁড়াল আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেলল, অনিরুদ্ধ এসেছ, অনিরুদ্ধ, উঃ কতদিন পরে যে দেখা হল!

অনিরুদ্ধকে বাঁ বাহুতে বেষ্টন করে নিয়ে মহারাজ ভিতরে ঢুকলেন। একেবারে শুক্তির শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অনিরুদ্ধ দেখল, অভাব কিছুরই নেই। ড্রেসিং টেবল্, দুখানা খাট, মাঝখানে নিচু টেবিল, বেতের আরামদায়ক চেয়ার, আলমারি, ওঅর্ডরোব, ফ্যান, স্নিগ্ধ পর্দা।

মহারাজ বললেন, তুমি চানটান করে খেয়ে দেয়ে নাও, আমার আফিসে আজ খুব কাজের চাপ। আমি ততক্ষণে কাজগুলো সেরে নিই গে।

শুক্তিকে বললেন, অনিরুদ্ধকে যত্নটত্ন ক'রো যেন।

শুক্তি বলল, সে আর আপনাকে বলতে হবে না মহারাজ।

মহারাজ বললেন, দেখ, তোমরা আমাকে আর 'মহারাজ' ব'লো না। আমি তো আর মহারাজ নেই, অনেকদিন নেই। এখন শুনলে বড় লজ্জা হয়। তাছাড়া সন্ন্যাসীদের মহারাজ বলে, তাঁরা বহু মানুষকে রঞ্জন করেন ব'লে। আমি মানুষকে আনন্দিত করতে তো পারি নি।

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, আপনি আমাদের কাছে সত্যিই মহারাজ। মহারাজ বলেই মনে করি আপনাকে। আপনি অন্তরের মহারাজা।

শুক্তি বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি মহারাজার মতোই দেখি।

—হবে বা, তাহলে তোমরা থাকো, আমি যাই অনিরুদ্ধ।

বলে তিনি চলে গেলেন। শুক্তি গিয়ে সিঁড়ির দরজা দিয়ে এল।

অনিরুদ্ধ তখন ওর সুটকেশ খুলতে বসেছে।

শুক্তি বলল, এই এখন ওসব থাক, যাও চান-টান করো, তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অবশ্য ক্লান্ত কিন্তু বড় সুন্দর, তুমি আরও সুন্দর হয়েছ, কেন গো প্রেমে-ট্রেমে পড়েছ নাকি ?

—প্রেমে পড়লে মানুষ সুন্দর হয় নাকি !

—কে জানে হয় হয়তো, না হলে তুমি এত সুন্দর হলে কেমন করে ?

—আমি প্রেমে পড়েছি ?

—পড় নি ? মিথ্যুক, আমি জানতে পারি নি বুঝি মনে কর ? আচ্ছা এখন যাও চান করে এসো।

অনিরুদ্ধ চান করে এসে ধোয়া ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরল, স্যাণ্ডেল পায়ে দিল।

খাবার টেবিলে আহার্য প্রস্তুত ছিল, সামনে বসেছিল শুক্তি।

অনিরুদ্ধ খেতে বসলে শুক্তি শুধোল, মা ভালো আছেন ?

—হ্যাঁ, ভালোই আছে।

—আমাদের কথা বলেন মাঝে মাঝে ?

—প্রায়ই বলে প্রায়ই, তোমাকে মায়ের খুব ভালো লেগেছে।

—তুমি কেমন আছ !

—ভালো নেই।

—কেন ?

—এখন নয়, এখন নয়, পরে বলব।

খাওয়া শেষ হলে অনিরুদ্ধ বলল, চলো, সুটকেশটা খালি করতে দাও।

—চলো দেখি, আমার জন্যে কি উপহার তুমি এনেছ ?

দুজনে ঘরে এল। অনিরুদ্ধের সুটকেশ খোলাই ছিল। সুটকেশ থেকে বার করল শুক্তির জন্যে মুর্শিদাবাদ সিল্কের চমৎকার নক্সা-করা শাড়ি ব্লাউজ। একগাদা ইংরেজি-বাংলা নতুন নতুন ঝকঝকে বই, একটি দামী ফাউণ্টেন পেন।

শুক্তি শুধোল, এই, মহারাজের জন্যে কি এনেছ ?

—কিছু তো আনি নি।

—যাঃ কি মনে করবেন, ঠিক আছে, পেনটা ওঁর জন্যে এনেছ বলব।

—তাই দিও, তুমি চিঠি লিখবে বলে এনেছিলাম, ভেবেছিলাম, হয়তো পেনের অভাবে তোমার চিঠি লেখা হয় না।

—সত্যি তুমি আমার চিঠির প্রত্যাশা করতে, তাহলে তুমি দাও নি কেন ?

—কেন দোব, যে দূরে যায় সেই তো আগে চিঠি দেয়।

একটু থেমে অনিরুদ্ধ করুণ মুখ করে বলল, এই কাপড়টা এখন পরবে একবার !

—যাঃ এখন কি ?

—কেন ? বিকেল হয়ে গেছে, গা ধুয়ে নতুন কাপড় পরবে, তাই তো নিয়ম।

—কোথাও গেলে পরব, কতদিন যে সিনেমা দেখি নি।

—যাবে দেখতে ?

—মহারাজ !

—মহারাজকে বললে তো না করবেন না, তুমি সেজে নাও।

শুক্তি সেজেগুজে ওর সামনে এলে অনিরুদ্ধ মুগ্ধ হয়ে বলল, বাঃ বড় সুন্দর সাজতে জানো তো তুমি ! কিন্তু সিঁথে সাদা কেন ?

—উনি সিঁদুর এনে দেন নি, আমারও ভালো লাগে না।

অনিরুদ্ধ গিয়ে অফিস থেকে মহারাজকে ডেকে আনল।

মহারাজ বললেন, যাও তোমরা, সিনেমা দেখে এসো, তাতে আমার অনুমতির আবার কি দরকার ? ও তো একদম বাড়ি থেকে বেরয় না, তুমি বেশ কিছুদিন থেকে ওকে নিয়ে সব দেখে শুনে নাও। আমি তো অফিসের কাজে নানান জায়গায় যাই, ওর কিছু দেখা হয় না।

মহারাজ ওদের দুজনকে দেখছিলেন। কি আশ্চর্য মানিয়েছে দুজনকে, যেন কাম আর রতি, যেন কৃষ্ণ আর রাধা। কোনও দিন শুক্তি সাজে না। আজ কি যে যত্নে ও নিজেকে সাজিয়েছে ! স্বর্ণ কঙ্কণ-পরা ওর মৃণালের হাত, চুল বেঁধেছে খোঁপা করে, আধো-ঘোমটার ছায়ায় সেই খোঁপা আর মুখ কি যে আশ্চর্য মধুর মনে হচ্ছে, মুনিজনেরও মতিভ্রম হবে। আর আনন্দ যেন ঢেউ দিয়ে ফিরছে শুক্তির সারা মুখে, সর্ব অবয়বে। উনি দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন দুজনে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

রাত্রি ন'টা নাগাদ সিনেমা থেকে ফিরে এসে অনিরুদ্ধ মহারাজকে দেখতে পেল না।

—মহারাজ কোথায় গেছেন ?

শুক্তি বলল, উনি বোধহয় ধ্যানে বসেছেন ঠাকুর ঘরে।

—ঠাকুর ঘর ?

—হ্যাঁ, ছাদের নিরিবিলি ঘরটাকেই আমরা ঠাকুরঘর বলি, উনি ওখানে প্রতিদিন ধ্যানে বসেন।

শুক্তির ঘরেই দুজনে বসেছিল। নিয়নের দুধ-আলোর বন্যায় ঝলমল করছিল দুজনেই। দুজনেই দুজনকে দেখছিল মুগ্ধ হয়ে।

মহারাজ ঠাকুরঘরে খালি পায়ে গিয়েছিলেন। ছাদ থেকে নেমে শুক্তির ঘরের দিকে আসছিলেন, ওদের কথা শুনে আর আগাতে সঙ্কোচ হল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, শুনতে পেলেন

শুক্তি বলছে, আমার জন্যে তো অনেক উপহার এনেছ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, কত রকম চমৎকার সব বই, সুন্দর কলম, আর কি উপহার এনেছ ?

—বলব না, বলা উচিত হবে না।

—উচিত অনুচিত থাক, তুমি বলো আমার শুনতে বড় সাধ, মহাকবি চণ্ডীদাসের কবিতার সেই দুটি লাইন আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

—কোন দুটি লাইন, কোন কবিতা ?

—সেই যে

"মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নেই সখি তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা"

তাই বলছি, তুমি বলো আর কি এনেছ ?

অনিরুদ্ধের নিটোল ভরাট মধুর কণ্ঠ হঠাৎ ভেঙ্গে গেল, বলল, আর এনেছি আমার আগুন-জ্বালা হৃদয়। আমি এতদিন মেয়েদের গ্রাহ্য করিনি। হয়তো আমার রূপের, বিদ্যার অহঙ্কার ছিল, তাই মেয়েদের দিকে আমি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছি। কোনো ছেলে প্রেমে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে শুনলে হো হো করে হেসেছি। হয়তো আমার মা তাঁর চরিত্রবল দিয়ে নারীর মোহিনী জাদু থেকে আমাকে আড়াল করেও রেখেছিলেন। কিন্তু যেদিন হাওড়া স্টেশনে তোমার চোখে চোখ পড়ল সে দিনই বুঝলাম আমার মরণ এলো।

ঠিক তখন তখনই বুঝতে পারিনি। এই একমাস ধরে প্রতি মুহূর্তে বুঝলাম আমার কি খোয়া গেছে, আমার দিনরাত্রি কোন বেদনায়, কোন দাহে হাহাকার করছে।

শুক্তি বলল, আমি সারাজীবনই ভাগ্যের হাতের পুতুল হয়ে রইলাম। আমি কেমন করে বোঝাব আমার মন কোথায় পড়ে থাকে, দিনেরাতে জাগরণে শয়নে স্বপনে কার কথা সে ভাবে! এ যে কি হয়ে গেল! আহারে আমার শ্যাম, তোমার মতো ছেলে, তোমার মায়ের সাতরাজার ধন এক মানিক, আমি হতভাগী নিজে মরলাম, তোমাকেও মারলাম!

একটু চুপ করে থেকে বলল, অনিরুদ্ধ, গতবারে যে তুমি আমাকে তোমার কবিতা শোনাবে বলেছিলে, সে কবিতা কই?

—তাও এনেছি, আমার নতুন কবিতার বই, সব কবিতাই তুমি চলে এলে লেখা, সবই তোমার জন্যেই লিখেছি, লিখতে বাধ্য হয়েছি. আর কিছু তো ভাবতে পারিনি। লজ্জা হচ্ছিল, দিই নি এতক্ষণ।

—সে কি! আসল উপহারই বাদ দিলে!

অনিরুদ্ধ স্যুটকেশের তলা থকে চটিমতো একখানি সুন্দর প্রচ্ছদপটের বই বার করে শুক্তির হাতে দিল। মলাট উল্টে শুক্তি দেখল, ছাপানো আছে, তোমাকেই দিলাম।

শুক্তি বলল, একটা কবিতা আমাকে পড়ে শোনাবে?

অনিরুদ্ধ বইটা হাতে নিয়ে একটা কবিতা বেছে পড়তে লাগল, ওর সুন্দর উচ্চারণ, মোটাবাঁশের বাঁশীর মতো গলা আর আবেগ মিলে সে পাঠ বড় অপরূপ শোনাল—

মোহিনী রূপের মায়া
সিন্দুর ছন্দিত শাখে দেখি আমি ভেলকি কঙ্কালের।
উচ্চাবচ শরীর-কবর খুঁড়ে দাঁতালো করোটি দেখি
প্রাকৃত ললাটে তার মেরুনের টিপ।
কবরের পাশে জমা জংলী রঙ শ্যাওলা শাড়ির ক্যাকটাস গাছে
হিংগুল উদভ্রান্ত অট্টহাসি।
এর চেয়ে ভালো মধ্যরাত্রে শিবাডাকা শ্মশানের বনে
ত্রিশূলে রুদ্রাক্ষ মালা
তরল-আগুন-ঢালা মৃত্তিকার ভাঁড়।

ক্যাকটাসে হলদে ফুল,
করোটিতে জাফরান টিপ,
আঁখির কোটরে অন্ধ নরকের রঙ,
শ্যাল-চাঁটা সাদা হাড়ে হাসির ডুগডুগি,
শুক্তি-সোনার কাঠি
অরণ্য-পর্বত-শ্যাম-চাঁদিনী-কুহক
দিয়েছ ফিরিয়ে।

মহারাজ ওদের বাধা না দিয়ে, বিরক্ত না করে, আবার ছাদের নিঃসঙ্গ ঠাকুরঘরে নিঃশব্দে ফিরে গেলেন।

(৮)

রাত্রে খাবার টেবিলে মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, তুমি শুক্তিকে নিয়ে দিন দশেক ঘুরে এসো, অজন্তা, ইলোরা, কন্যাকুমারিকা, কাছাকাছি অনেক সব জিনিস দেখবার আছে। ওর তো কোথাও যাওয়া হয় না, আমার এখন অফিসে বড্ড চাপ চলছে, নাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম।

অনিরুদ্ধ বলল, আপনিও চলুন।

—সত্যি আমি যেতে পারছি না, দ্বিধা কোরো না, ওকে জায়গাগুলো দেখিয়ে দাও ভাই, তোমার নিজেরও দেখা দরকার। কালই বেরিয়ে পড়, দেরি করে কি হবে?

অতএব পরের দিন অনিরুদ্ধ আর শুক্তি বেরিয়ে পড়েছিল। দিন দশেক দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র ঘুরেছিল। নর্মদাতীরের মনোরম শোভা, কন্যাকুমারিকার উদ্দাম সমুদ্র-নীলিমা, অজন্তার গুহাচিত্রের ঐশ্বর্য ওদের আরও আচ্ছন্ন অভিভূত করেছে, ওরা কখনও ট্রেনে, কখনও বা হোটেলে রাত কাটিয়েছে। নিজেদের অফুরন্ত কথা তবু যেন শেষ হয় নি।

দিন দশেক পরে একদিন বিকেলবেলায় ওরা শ্রান্ত ক্লান্ত কিন্তু আনন্দের পেয়ালা উপচে নিয়ে মাদ্রাজে কোয়ার্টার্সে ফিরে এল। মহারাজ তখন অফিস থেকে ফিরে ঠাকুর ঘরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

সে রাত্রে তাড়াতাড়ি ওঁরা খেতে বসেছিলেন। খাবার টেবিলে অনিরুদ্ধ বলল, আমি এবার বিদায় নোব, মহারাজ।

শুক্তি বলল, না, তুমি যেও না, তুমি থাকো, ছুটি তো আছে, কেন যাবে! মহারাজ, আপনি ওকে থাকতে বলুন।

মহারাজ বললেন, থাকবে, থাকবে, অত ভয় কেন শুক্তি?

খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁরা তিনজনে শুক্তির ঘরে বসেছিলেন। মহারাজ বসেছিলেন বেতের চেয়ারে। মহারাজের বাঁদিকের খাটে বসেছিল শুক্তি আর ডানদিকের খাটে বসেছিল অনিরুদ্ধ।

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, শুক্তি, আমি আজ একটা বিশেষ জরুরী কথা তোমাদের বলতে চাই।

শুক্তি নম্রধীর ভাবে বসেছিল, ওর কোনো ভাবান্তর হল না। অনিরুদ্ধ সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসল।

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, তুমি শুক্তিকে ভালোবাসো?

অনিরুদ্ধ প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর বলল, ওকে কে না ভালো-বাসবে মহারাজ? ও খুব ভালো, ওর ব্যবহার কত সুন্দর!

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, আমি তেমন ভালোবাসার কথা বলছি না, পুরুষ নারীকে যেমন করে ভালোবাসে, যে ভালোবাসার কথা পৃথিবীর কাব্যে সাহিত্যে লেখে, যে ভালোবাসার সঙ্গে আগুনের তুলনা দেওয়া হয়, আমি সেই ভালোবাসার কথা বলছি, যাকে ভালো কথায় বলে 'প্রেম'।

অনিরুদ্ধ স্পষ্ট দ্বিধাহীন গলায় বলল, হ্যাঁ মহারাজ ভালোবাসি, আমি আমার মনকে শাসন করতে পারি নি।

মহারাজ শুক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, শুক্তি, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

শুক্তি বলল, মহারাজ, আমি আপনাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি।

মহারাজ বললেন, কথা বাড়িও না শুক্তি, আমার কথার সঠিক জবাব দাও, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

এবার শুক্তি বলল, আপনাকে ভালোবাসা যায় না মহারাজ, আপনাকে কোনোদিন আমি সে চোখে দেখি নি।

মহারাজ বললেন, শুক্তি, তুমি কি অনিরুদ্ধকে ভালোবাসো?

শুক্তি নম্র কণ্ঠে ধীর ভাবে বলল, হ্যাঁ বাসি।

মহারাজ কতক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, অনিরুদ্ধ, আমি শুক্তিকে ভালোবেসেছিলাম। আমার নিঃসঙ্গতা ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। আমার কেমন মনে হয়েছিল শুক্তিও আমাকে ভালোবেসেছে। ওর ভক্তি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমকে আমি ভালোবাসা বলে ভুল করেছিলাম। কিংবা ভালো যদি ও বেসেও থাকে সে ভালোবাসা মেয়ে যেমন বাবাকে ভালোবাসে, শিষ্যা যেমন গুরুকে ভালোবাসে, তেমনি ভালোবাসা, সে ভালোবাসার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার গাঢ় অনুরাগ থাকা সম্ভব ছিল না। তোমাকে আর শুক্তিকে একসঙ্গে দেখে আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসা মানে হল আনন্দ, তোমাকে দেখে শুক্তির চোখে মুখে প্রাণের ছন্দে যে আনন্দের ঢেউ লাগে সে যেন আমার কাছে এক বিস্ময়।

অনিরুদ্ধ বলল, কিন্তু মহারাজ, আপনিতো শুক্তিকে ভালোবেসেছেন তাহলে আপনার এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেন?

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, শুক্তিকে কে ভালোবেসেছে না-বেসেছে এখানে সেটা জরুরী প্রশ্ন নয়, শুক্তি কাকে ভালোবেসেছে সেইটেই আসল ব্যাপার। আমি স্বার্থপরের মতো শুক্তিকে আমৃত্যু সঙ্গী হিসেবে চেয়েছিলাম, আমি ওকে ঠিক স্ত্রী হিসেবে চাইনি। কিন্তু এক অনাত্মীয় মেয়েকে কেমন করে সঙ্গে রাখব বুঝতে না পেরে আমি ওকে বিয়ে করে কাছে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ে যেমন বাবার সঙ্গে বিবাহিতজীবন যাপন করতে পারে না, শুক্তির পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না, আমিও ওকে সেভাবে চাই নি অনিরুদ্ধ।

একটু থেমে বললেন, আমি যেমন শুক্তিকে ভালোবেসে জলছিলাম, এক মুহূর্ত তার বিরহ সহ্য করতে পারছিলাম না, তেমনি আমার মনের ভিতরে অনেক দ্বিধা ছিল, অনেক দ্বন্দ্ব ছিল! আমি চাইছিলাম শুক্তি এমন কারও বৌ হোক যে মানুষ আমাকে বুঝবে, শুক্তিকে আমার কাছে আসবার সহজ অনুমতি দেবে। আমি তোমাকে তেমনি মানুষ ভেবেছিলাম, শুক্তির বর হিসেবে তোমাকে আমি মনে মনে পছন্দ করেছিলাম, যদিও তখনও আমি দ্বন্দ্বমুক্ত হতে পারি নি।

আবার একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, সেইজন্যেই হাওড়াস্টেশনে তোমাদের মধ্যে যাতে বন্ধুত্ব হয় তার চেষ্টা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, শুক্তিকে দেখে তুমিও মুগ্ধ হবে। কিন্তু তুমি যখন হঠাৎ বললে বিয়ে করে তবে শুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তখন আমার সব গুলিয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিতে আমি পারলাম না! কেমন যেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম ভাঁড়ের মতো। বিয়ের প্রহসন ঘটে গেল, আমি হলাম তার নায়ক। কি লজ্জা অনিরুদ্ধ!

অনিরুদ্ধ বলল, মহারাজ, আমিও তখনই নিজেকে ঠিক বুঝতে পারি নি, তখন সমাজ, শোভনতা, মোটা যুক্তিই আমার মাথায় ছিল, মানুষ সবসময়ে তার তাৎক্ষণিক উপলব্ধি বুঝতে পারে না।

মহারাজ বললেন, ঠিক তাই, তা সম্ভব ছিল না, যেমন নাকি আমি এতটা বয়সে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সঙ্কটকালে মতিস্থির করতে পারলাম না, নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করলাম।

মহারাজ হঠাৎ থেমে গেলেন। গাঢ় স্তব্ধতা মেঘের মতো ঘনিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

তারপর মহারাজ হঠাৎ বললেন, অনিরুদ্ধ, একটা অনুরোধ আমার রাখবে, আমি অনেক ভেবে বলছি. আর আমার কোনো ভুল হয় নি।

অনিরুদ্ধ বলল, বলুন মহারাজ!

মহারাজ বললেন, তুমি শুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, ওকে তুমি বিয়ে করে তোমার বৌ কোরো।

শুক্তি আপাদমস্তক শিউরে উঠল, অনিরুদ্ধ হতবাক হয়ে বসে রইল।

মহারাজ আবার বললেন, অনিরুদ্ধ তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যা বলি না, আমি সত্যকেই বরণ করতে চেয়েছি, আর শুক্তিকে তুমি নিশ্চয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে, কেননা তুমি ওকে ভালোবাসো, অনিরুদ্ধ, শুক্তিকে অমি ভ্রষ্ট করিনি, আমরা কখনো এক বিছানাতেও শুই নি। আমি পঁয়ত্রিশ বছর সন্ন্যাসী ছিলাম, আমার দীর্ঘদিনের মজ্জাগত সংস্কার, আমার আত্মসম্মান আমাকে বাধা দিয়েছে, ওর নীরব প্রতিরোধ প্রতিমুহূর্তে আমি অনুভব করেছি, তাছাড়া আমি তো ওকে তেমন করে চাইনি অনিরুদ্ধ আমি ওকে সঙ্গী বা বন্ধুরূপেই চেয়েছিলাম, ও ছিল আমার আনন্দ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, তার মানে এই নয় যে তোমার

স্ত্রীর সঙ্গ কামনা করে ভবিষ্যতে আমি কোনো ছোঁচামি করব, সেও আমার কাছে আত্মঅবমাননা বলে মনে হবে। তোমরা আমাকে মহারাজ বলো, আমি রাজার মতোই থাকতে চাই, কারও করুণা চাই না।

মহারাজ আবার বললেন, শুক্তি তোমার বৌ হবে, এর চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। আমি তোমার মাকেও চিঠি লিখে দিয়েছি।

একথা বলে পকেট থেকে চিঠির খসড়াটা বার করে চোখের সামনে ধরে বললেন, লিখেছি—

অনিরুদ্ধ শুক্তিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভালোবেসেছে, শুক্তিও অনিরুদ্ধের প্রতি গোপন অনুরাগে ভুগছে। এই অবস্থায় ওদের স্বামী স্ত্রী হওয়া উচিত। প্রেমকে হত্যা করা মহাপাপ। আমাদের এই দুর্লভ জীবনে অচরিতার্থ ভালোবাসার মতো দুঃসহ কষ্টকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া অনিরুদ্ধের সঙ্গে শুক্তির মতো মেয়েকেই ঠিক মানায়। আপনি জীবনে দুঃখ পেয়েছেন তাই গোঁড়ামি বা ক্ষুদ্রতা নেই আপনার। আমাদের বিয়ের প্রহসনের খবরও কেউ জানে না। অতএব শুক্তিকে আপনার পুত্রবধূ করুন। আমি জীবনকে কিছু বুঝেছি, আমি বলছি, ওরা সুখী হবে, খুব সুখী হবে।

অনিরুদ্ধ বলল, কিন্তু মহারাজ আপনি তো শুক্তিকে ভালোবেসেছেন, আপনার সেই অসহায় যন্ত্রণা আমি দেখেছি। আমি কেমন করে আপনাকে এত বড় আঘাত দিয়ে আপনার বন্ধু শুক্তিকে নিয়ে যাব।

মহারাজ বললেন, অনিরুদ্ধ, আমি এই একমাসেই মনে মনে আরও এগিয়েছি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি এখন প্রেম-অপ্রেম থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। শুক্তিকে নিয়ে গিয়ে তুমি আমাকে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি দিলে সত্যের পথে হাঁটতে আমাকে কিছু সাহায্য করবে, তাতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

মহারাজ আবার বললেন, আমাদের বিয়েটা একটা প্রসহন, মিথ্যা ব্যাপার, ওর কোনো মূল্য নেই। সে বিয়ের সাক্ষী বলো, কর্তা বলো, সবই তুমি। অতএব তুমি গুরুত্ব না দিলে ওর কোনো গুরুত্ব নেই। বিয়ের মন্ত্রও আমরা দুজনের কেউই উচ্চারণ করি নি। তবু যদি তোমার মনে হয় তারও কিছু মূল্য আছে তাহলে আমি ডিভোর্সের ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। তবে

ডিভোর্সের দলিল-টলিল করলেও ব্যাপারটাকে অযথা স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আমি তা চাইছি না।

অনিরুদ্ধ বলল, তার কোনো দরকার নেই, মহারাজ।

মহারাজ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর হঠাৎ বললেন, এবং তোমাদের এখনই চলে যেতে হবে, আমি টিকিট কিনে রেখেছি, আর ঘণ্টা খানেক পরেই ট্রেন, আমি অফিসের দারোয়ানকে গাড়ি ডাকতে বলে দিয়েছি।

শুক্তি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অনিরুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

মহারাজ কতক্ষণ শুক্তির সেই কান্না কান পেতে শুনলেন তারপর বললেন, আমিও আর বেশিদিন এখানে থাকব না। কোথায় যাব, কি করব তা কারও জানবার দরকার নেই। কিন্তু অনিরুদ্ধ কলকাতা গিয়েই তুমি শুক্তিকে বিয়ে করে ফেলবে, এক মুহূর্ত দেরি করবে না, দ্বিধা করবে না, তুমি আলো ফুল গান উৎসব ভালোবাসো, তুমি তোমার মায়ের একমাত্র সন্তান, তোমাদের বিয়েতে ফুল আলোর যেন কৃপণতা না হয়, গান যেন বাজে। বাবার যেমন মেয়ের জন্যে কিছু উদ্বেগ থাকে তেমনি শুক্তির জন্যে আমারও কিছু উদ্বেগ থাকবে, কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, তোমার হাতেই ওকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, উদ্বেগও আর মনে রাখব না। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, তুমি ঠকবে না, তুমি অসামান্য কিছু পেয়েছ বিশ্বাস করে নিজেকে ধন্য মনে কোরো।

একটু থেমে বললেন, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, আমি নিজে গিয়ে তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।

বলে সামান্য সময় নীরবে বসে থেকে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহারাজের এই অমোঘ আদেশ মানতেই হবে, লঙ্ঘন করবার উপায় নেই, একথা বুঝে ওরা পরস্পরকে কোনো কথা না বলতে পারলেও নিঃশব্দে তৈরী হয়ে নিল। তৈরীর আর কি, দুজনের দুটি সুটকেশ।

তারপর একসময়ে মহারাজের সঙ্গে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসতে হল।

স্টেশনে পৌঁছনোর একটু পরেই ট্রেন এসে দাঁড়াল। নির্দিষ্ট ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে ওদের তুলে দিয়ে মহারাজ ওদের কাছে একটু বসলেন। তিনজনেই নির্বাক।

মহারাজ বললেন, শুক্তি, সেই গয়নার বন্ধকী দোকানে আমি টাকা পাঠিয়েছি, অনিরুদ্ধকে পাঠিয়ে বালাটা আনিয়ে নিও।

পকেট থেকে মনিঅর্ডারের রসিদ আর বন্ধকী রসিদ বার করে বললেন, এগুলো কাছে রেখে দাও।

মহারাজ পকেট থেকে দুটি টিকিট বার করে আবার বললেন, শুক্তি টিকিট দুটো রাখো, তুমি আমাকে একদিন স্নেহবশে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলে তাই না, আজ আমিও তোমাকে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দিয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম।

তারপর একটি ব্যাঙ্ক-চেক অনিরুদ্ধের হাতে দিয়ে বললেন, অনিরুদ্ধ এটা রাখো, সামান্য হাজার টাকা তোমাকে যৌতুক দিলাম, কলকাতায় ভাঙিয়ে নিও, তোমার আরও বেশী পাওনা ছিল, কিন্তু আমার আর ক্ষমতা নেই ভাই।

অনিরুদ্ধ বলল, কোনো দরকার ছিল না মহারাজ।

মহারাজ বললেন, তোমার মাকে দিও, পুত্র সন্তানের বিয়েতে এটুকু না পেলে মায়েরা খুশি হন না।

অনিরুদ্ধ আর কিছু না বলে চেকটা হাতে নিল।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, মহারাজ, আপনি এখানে আর কতদিন থাকবেন?

—আমার কিছু ঋণ আছে অনিরুদ্ধ, ঋণটা শোধ করতে পারলেই চলে যাব, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, তুমি এই চাকরি জুটিয়ে না দিলে আমাকে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকতে হত।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল, শুক্তি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল তারপর নত হয়ে মহারাজের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

মহারাজ ওদের মাথায় হাত ছুঁইয়ে নীচে নেমে গিয়ে ওদের জানলার কাছে দাঁড়ালেন। ট্রেন ছেড়ে দিলে জানলা ধরে হেঁটে যেতে যেতে বললেন, "শুক্তি দ্বিধা কোরো না, দুঃখ পেয়ো না।" ট্রেন স্পীড নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে লাগল। শুক্তির কান্নার উচ্ছ্বাস একমুহূর্ত শুনতে পেলেন মহারাজ। তাঁর মুখের উপর দিয়ে আলোকিত জানলার আলোর ঢেউ কিছুক্ষণ দ্রুতবেগে বয়ে গেল!

(৯)

(উপসংহার)

স্টেশন থেকে ফিরে মহারাজ সে রাত্রে ঘুমোতে গেলেন না, ছাদের ঠাকুর ঘরে গিয়ে সারারাত্রি ধ্যানে বসে রইলেন।

পরদিন যথারীতি তিনি অফিস করলেন। অফিসের ছুটি হলে উপরে শূন্য কোয়ার্টার্সে ফিরে চান সেরে ড্রয়িং রুমে গিয়ে সোফাতে বসলেন। সামনের নিচু সুন্দর টেবিলের উপরে একটি খামের চিঠি আর একখানা টেলিগ্রাম পড়েছিল। চিঠিটা খুলে আবার তিনি পড়তে শুরু করলেন। মাধুরী লিখেছে। 'প্রিয় বীরেশ' পাঠ লিখে নানান সাংসারিক সংবাদের পর লিখেছে, আমার বড় ইচ্ছা শেষ জীবনে তুমি আর আমি কাশীতে গিয়ে থাকি। আমাদের সেখানে কেউ চিনবে না, জানবে না। আমরা লোকচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে ঈশ্বরের চরণ ছায়ায় থাকব। সংসারে আর কেউ না বুঝুক, তিনি আমাদের ফেলতে পারবেন না।

মহারাজ মনে মনে বললেন, মাধুরী, তুমি তো জানো না, আমার সব মায়া সব মোহ সমাপ্ত হয়েছে। আমি যা চাই তারই সন্ধানে বাকী জীবন তোমাদের অজ্ঞাতে থাকব। আবার কেন নতুন করে তোমার পুরোনো স্বপ্ন দেখার সাধ! তুমি স্বাবলম্বী হও, আমাকে আর ডেকো না।

চিঠিটা রেখে তারপর তিনি টেলিগ্রামটা দেখলেন, হাতে তুলে নিয়ে গভীর স্নেহে টেলিগ্রামটি একবার মুখের উপরে বুলিয়ে নিলেন।

অফিসের দারোয়ান নীচে থেকে এসে জানাল, সাব, একজন সাধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

—সাধু! চলো চলো।

বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। দেখলেন, হোমানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন।

মহারাজ অভিভূত হয়ে বললেন, এসো হোম, আমি তোমারই অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি।

হোমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উপরে এসে ড্রয়িং রুমে তাঁকে বসালেন।

নিজেও মুখোমুখি সোফাতে বসলেন, বললেন, হোম তুমি আগে কিছু খাও, তাহলে আমি সুখী হব।

—আগেই খেতে হবে? নিয়ে এসো।

মহারাজ নিজে গিয়ে ঝকঝকে কাঁসার রেকাবিতে কিছু ভালো সন্দেশ আর মাজা পরিষ্কার কাঁসার গেলাসে জল নিয়ে এসে হোমানন্দের সামনে রাখলেন। হোমানন্দের খাওয়া শেষ হলে থালা গেলাস নিজেই রেখে এসে আবার মুখোমুখি বসলেন। তারপর দুজনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। মাথার উপরে বিজলী পাখার মৌমাছির ঝাঁকের মতো কিংবা জলস্রোতের মতো অদ্ভুত চাপা শব্দ বাতাসে ভাসতে লাগল।

হঠাৎ হোমানন্দ বললেন, আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলে?

—এই তো তোমার টেলিগ্রাম, কবে আসবে লেখ নি, নাহলে আমি স্টেশনে যেতাম তোমাকে আনতে।

—আমি আজকে এসে এখানকার আশ্রমে উঠেছি। তোমার চিঠি পেয়ে যে ভাবেই হোক আসতাম, মনিঅর্ডার করে দুপিঠের গাড়িভাড়া না পাঠালে হত।

—হোম, আমার চিঠি পেয়ে তোমার কি মনে হল, তোমাকে একবার শেষ দেখা না দেখে আমি তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, ভয় ছিল তুমি আসবে কিনা।

—ভয় থাকা তোমার উচিত ছিল না বীরেশ।

হোমানন্দ আবার বললেন, বলো এবার তোমার কথা বলো।

মহারাজ বললেন, তার আগে বলো, আমি আশ্রম ছেড়ে চলে আসার পর কি হল?

একটুখানি চুপ করে থেকে হোমানন্দ বললেন, পরের দিন এক ব্রহ্মচারী এসে তোমার সিল-করা চিঠি আমাকে দিলেন। পড়ে বজ্রাহত হলাম, আমি অতটা ভাবি নি, কিন্তু বুঝলাম তুমি মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করবে না, এই তোমার চরিত্র, যা সত্য বলে বুঝবে তা তুমি করবেই। তারপর আমি আশ্রমে জানালাম যে তুমি কিছুদিনের জন্যে কোনো জরুরী কারণে কোথাও গেছ, প্রয়োজন হলে নাও ফিরতে পার। উপরেও তাই জানালাম। উপর থেকে আমার উপর পরিচালনার দায়িত্ব এল।

মহারাজ বললেন, খুব ভালো হয়েছে। তোমার হৃদয় আছে, বুদ্ধি আছে, তুমি আশ্রমের আরও উন্নতি করতে পারবে।

একটু থেমে বললেন, যদি পার হোম, দরিদ্র নিরক্ষরদের কিছু কিছু সাক্ষর করবার ব্যবস্থা কোরো, অনাহারে কেউ আছে জানলে তার কাছে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো, আর ভেঙ্গেপড়া মানুষদের আশ্রমে টেনে এনে একটু উজ্জীবিত করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখো। আমি তো পারি নি, তুমি চেষ্টা কোরো।

হোমানন্দ বললেন, তা সম্ভব হবে না বীরেশ, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তো এই রকম স্থায়ী কিছু ব্যবস্থা আমরা মেনে নিয়েছি।

মহারাজ শান্তভাবে বললেন, তা ঠিকই ইচ্ছা থাকলেও সব কিছু করা যায় না, আমাদের সাধ্য কতটুকু!

একটু চুপ করে থেকে বললেন, মোটামুটি আমার সব খবরই তো তোমাকে জানিয়েছি। নতুন খবর, খুব ভালো ছেলের সঙ্গে আমি শুক্তির বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। সে তার ভাবী বরের সঙ্গে কলকাতা চলে গেছে।

হোমানন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন, শুক্তিকে না তুমি বিয়ে করেছিলে?

—সে অভিনয় মাত্র। শুক্তির সঙ্গে আমার কোনো দৈহিক সম্পর্ক ছিল না হোমানন্দ, আমরা ভ্রষ্ট হই নি।

—এত রকম করে তুমি কি বুঝলে, কি পেলে বীরেশ!

—সেই কথাই তোমাকে বলতে চাই হোম। দেখো, মৃত্যু অমোঘ বলে সকলেই নিজের নিজের জীবনের কোনো একটা তাৎপর্য খোঁজে, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে। আমার মনে হয়েছে, জীবনের তাৎপর্য তিনটে, হয় আত্মসুখী হওয়া, নয় বহুজন হিতায় জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ করা, নয় তো ঈশ্বরকে পেতে চাওয়া।

একটু নীরব হয়ে খুব চিন্তিতভাবে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, তা আত্মসুখী আমি কোনোদিন হতে চাই নি হোম, আমি সত্য বলছি, ও প্রবৃত্তি আমার মধ্যে ছিল না। আর সন্ন্যাসী হয়ে দেখলাম, সন্ন্যাসী কখনো বহুমানুষের জন্যে কিছু করতে পারে না। মুষ্টিমেয় ধনবান আর সঙ্গতি সম্পন্ন মানুষের কাছে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না। আমার মনে হয়, সাধারণ গৃহস্থ সাংসারিক মানুষই কোটি কোটি দেশবাসীকে কষ্টেসৃষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরা ধর্ম-অর্থ-কামের একসঙ্গে চর্চা করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে হিমসিম খায়, কিন্তু এরাই দরিদ্রকে কিছু দান করে, আতুরকে কিছু সেবা করে, দুঃখীকে সান্ত্বনা দেয়। গৃহস্থ নিজে শত দুঃখে থেকেও তার হৃদয়কে শুকিয়ে

যেতে দেয় না, নিজেকে কিছু বঞ্চিত করেও অন্যকে কিছু দেয়, এবং এই দানের কোনো তুলনা নেই। মহাভারতের সেই অর্ধস্বর্ণশরীর নকুলের উপাখ্যান মনে পড়ে। ভেবে দেখো কত হাজার হাজার বছর পৃথিবীতে কোটি কোটি দরিদ্র আতুর থেকেছে, তাদের কিন্তু টিকিয়ে রেখেছে এই সাংসারিক সাধারণ জনেরাই। সন্ন্যাসীরা নয়, এমন কি সন্ন্যাসীরা নিজেরাও গৃহস্থের কৃপায় বেঁচে থাকে। আর কি জানো, সন্ন্যাসী বা রাজনীতিকরা সঙ্ঘবদ্ধ, তাদের ভিক্ষা করার অধিকার আছে। কিন্তু গৃহস্থ নিঃসঙ্গ একক, তার সব দায়-দায়িত্ব তারই নিজের, তার ভিক্ষা করবার অধিকারও নেই। গৃহস্থ মানুষের এক পয়সা দু পয়সা ভিক্ষা, সামান্য মমতা, ক্ষুদ্রসেবার তুচ্ছাতি-তুচ্ছ পুঞ্জ পুঞ্জ দানে এই বিশাল নিঃস্ব লোকসমাজ এতদিন পৃথিবীতে টিকে থেকেছে। ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্য না আসা পর্যন্ত এরাই এই সব মানুষকে কায়ক্লেশে টিকিয়েও রাখবে।

একটু চুপ করে থেকে মহারাজ আবার বললেন, তাই সন্ন্যাস ব্যর্থ জেনে আমি গৃহস্থ হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ বয়সে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বড় ভীষণ প্রেম অনুভব করে আমার মতিচ্ছন্ন ধরেছিল। আমি তখনই আমার ভুল বুঝতে পারিনি।

একটু থেমে বললেন, তাহলে এখন থাকে ঈশ্বরদর্শনের দুঃসাধ্য সাধ।

অনেকক্ষণ আর কথা বললেন না মহারাজ। হোমানন্দও নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

তারপর নীরবতা ভেঙ্গে মহারাজ আবার বললেন, ঈশ্বরদর্শনের ইচ্ছার একটি অঙ্কুরও হয়তো আমার মধ্যে ছিল তাই নিপীড়িত মানুষদের জন্যে রাজনীতি না করে সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝেছি, সন্ন্যাসী মানুষের শরীরের ক্ষুধার জন্যে সত্যিকার কিছু করতে পারে না, মানুষের আত্মার কি করতে পারে জানি না। আমার মনে হয় সন্ন্যাসী যে হয় সে আদতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎই পেতে চায়, তাইই তার একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, তুমি আমি জানি হিমালয়ের দুর্গম নিভৃত গুহা-গহ্বরে কত সন্ন্যাসী ঈশ্বরের দর্শন-প্রার্থনায় দিনরাত তাঁদের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর দুঃখের আগুন জ্বেলে বসে আছেন। আমার মনে হয়েছে তাঁরাই খাঁটি সন্ন্যাসী, অন্তত তাঁদের চাওয়ার মধ্যে কোনো খাদ তাঁরা মেশান

নি। অকপটভাবে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোজা সরল ইচ্ছাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন, হোমানন্দ, আমার এই-সব উপলব্ধির কথা তোমার মতো কাউকে বলবার বড় দরকার ছিল আমার।

মহারাজ আবার কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন, তারপর বললেন, আমার কিছু টাকার ঋণ আছে, সেই ঋণ শোধ হলেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব মোহ, সব বন্ধন, সব দায়-দায়িত্ব কর্তব্য, সব অভিমান ত্যাগ করে আমি হিমালয়ে যাব। সকলের অজ্ঞাতে থেকে আমি এবার শুধু ঈশ্বরকেই খুঁজব। জানি কিছু পাব না, সে প্রতিভা, সে সাধনার শক্তি আমার নেই, তবু সর্বদ্রষ্টা সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে মাথা নত করে বলব, হে অনাদি, হে অসীম আমাকে তোমার অনাদি-অনন্ত আনন্দের কণামাত্র দাও, আমাকে তোমার বিশ্বভুবন-ব্যাপী চরণ-ছায়ার উপলব্ধি দাও।

এইভাবে তাঁর কথা শেষ করে মহারাজ বললেন, হোমানন্দ, হয়তো তোমাকে আমার কথা কিছু বোঝাতে পারলাম না, হয়তো আমি নিজেও কিছু বুঝি না. তবু তোমারই কাছে কিছু বলতে পেরে আমার বড় ভালো লাগল।

হোমানন্দ কথা না বলে নিঃশব্দে বসে রইলেন। মহারাজও নীরব হয়ে ছিলেন।

দুজনে জোয়ারের নদীর মতো উদ্বেল কোন আবেগে স্থির অচঞ্চল হয়ে রইলেন।

কতপরে হোমানন্দ বললেন, বীরেশ মহারাজ, জ্ঞানানন্দ, আমি জানিনা তুমি কিসের সন্ধানে অমন আকুল হয়ে আছ। হয়তো আর আমাদের দেখা হবে না। আমাদের দুজনেরই মৃত্যুও আর বেশি দূরে নেই, সন্ধ্যার ছায়া দেখছি। আমি শুধু এই আকাঙ্ক্ষা করি, তুমি যেন অবশেষে পরমশান্তির স্বাদে ধন্য হতে পার।

একটু চুপ করে থেকে হোমানন্দ আবার বললেন, সন্ধে হতে আর দেরি নেই, এখানে আশ্রমে ঠাকুরের আরতির সময় আমাকে থাকতে হবে। আমি এবার বিদায় হব বীরেশ।

হোমানন্দ উঠে দাঁড়ালেন, বীরেশ মহারাজও উঠলেন।

দুজনে একসঙ্গেই ঘর থেকে বাইরের দিকে এলেন। বিদায়ের সময় এখন। মহারাজ দুহাত প্রসারিত করলেন হোমানন্দের দিকে, হোমানন্দও দুহাত

প্রসারিত করে মহারাজকে আলিঙ্গনে জাপটে ধরলেন। কতক্ষণ দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে থাকলেন।

তারপর দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

রাস্তায় গিয়ে হোমানন্দ বললেন, তাহলে যাই মহারাজ!

মহারাজ কথা বলতে পারলেন না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হোমানন্দ হাঁটতে হাঁটতে আগিয়ে চললেন। কিছুদূর গিয়ে সন্ন্যাসীর উচিত নয় জেনেও মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলেন তখনও জ্ঞানানন্দ তাঁরই দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হোমানন্দ পদক্ষেপ দ্রুত করলেন।

সমাপ্ত ॥

দুর্গা

মেঘ-থম্‌থমে আকাশ। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে ইলশেগুড়ি ঝরছে। পুব হাওয়া বইছে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। পিচের রাস্তায় থক থকে কালো কাদা। ও বসেছিল বাঙ্গুর হাসপাতালের গেটের সামনে। এক ঠ্যাং সামনে ছড়িয়ে আর একটা ঠ্যাং গুটিয়ে। পিছন দিকে মাটিতে দুহাতের তালু পেতে শরীরের ভার রেখেছিল। একেবারে নগ্ন। মাথা ন্যাড়া। ছিপছিপে চেহারা, বেতসলতার মতো বলা যায়। তেইশ-চব্বিশের নিখুঁত যৌবন কালি-লেপা, ময়লা। গায়ে কোথাও কোনো কাপড় নেই, গয়না নেই, মাথায় চুল নেই, সম্পূর্ণ নগ্ন। ছড়ানো পায়ের পাতার তলায় দগদগে মস্ত ঘা। সেপটিক হয়ে গেছে, পায়ের পাতা ঢোল হয়ে ফুলেছে। ও ডাক্তারদের দৃষ্টি টানবার চেষ্টা করছে ককিয়ে ককিয়ে চীৎকার ক'রে। বোধহয় কয়েকদিন খাওয়া হয়নি, জোরে চেঁচাবার ক্ষমতা নেই। বৃষ্টিতে ভিজে কাদার উপরে বসে থেকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ও অনেক চেঁচামিচি করল, কেউ গ্রাহ্য করল না। অনেকেই ওর শরীরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, মনে মনে রসিয়ে উঠে কেটেও পড়ল। কেননা ওর গায়ে অনেক দিনের জমানো কালি-মাখা ময়লা, দুর্গন্ধ উঠছে।

একজন তরুণ ডাক্তার একজন তরুণী উচ্ছল নার্সের সঙ্গে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ও চেঁচিয়ে কাঁদল, ডাক্তারবাবু! ডাক্তার ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে নার্সের চোখে চোখ ফেলে মুচকি হেসে কি ইঙ্গিত করল। গম্ভীর কায়দায় দুজন ডাক্তার ওর চেঁচানি গ্রাহ্য না করে চলে গেল। অনেক মোটর গাড়ী ঢুকল বেরল। অবশেষে ও অদ্ভুত কায়দায় ক্ষত ঠ্যাংটা ছড়িয়ে রেখেই দুহাত আর একটা পায়ের সাহায্যে রাস্তা পার হয়ে চায়ের দোকান-গুলোতে খাবার চেয়ে চেয়ে আগিয়ে যেতে লাগল।

মধু ওর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। ও মধুর সামনে গিয়ে খাবার চাইল। মধু নারী-বিলাসী। একা মানুষ। মাইনে পায় ভালো। বই, সিগারেট আর মেয়েমানুষে তার মাসিক খরচ অনেক। জীবন নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা কি দায়িত্ব নেই ওর। মধু আশ্চর্য হয়ে দেখল,

মেয়েটাকে দেখতে তার প্রথম কৈশোরের বয়সে বড় প্রেমিকা স্থলতাদির মতো। ভিতরটা ফাল্গুন হয়ে উঠল ক্ষণেক।

মধু বলল, তোকে হাসপাতালের গেটে দেখলাম।

ও বলল, পায়ে ঘা, কেউ শুনল না।

—কি হয়েছিল ?

—কেটে গিয়েছিল।

—মাথা ন্যাড়া ?

—চার আনা পয়সা দিয়ে চুল কেটে নিয়েছি।

—হুঁ, কি নাম তোর ?

—দুর্গা।

উচ্চারণের স্পষ্টতা দেখে অবাক হল মধু।

—আমার বাড়ীতে কাজ করবি ?

—কি করে করব ?

—সেরে গেলে ?

মেয়েটা কেঁদে ফেলল, আমি মরে যাব, সব শরীর ফুলবে।

মধু আরও খুঁটিয়ে দেখল মেয়েটার সর্বাঙ্গ। নিখুঁত সুন্দর দেহ। অনুদ্ধত কিন্তু মোহময়। ময়লায় ঢাকা আছে বলে বোঝা যায় না। বোধহয় জ্বরও হয়েছে ঘায়ের তাড়সে। অনেকদিনের উপবাসে, কষ্টে, জঘন্য অত্যাচারে বোধ-বুদ্ধিও ঘোলাটে হয়ে গেছে। লাজলজ্জা ভয় ডর নষ্ট হয়ে গেছে।

বলল, আয় বাড়ীর ভিতরে আয়।

—ভেতরে ?

—ভয় কি তোর ? আশ্বাসের হাসি হাসল মধু।

মেয়েটা তেমনি ভাবে সিঁড়ি উঠে ভিতরে ঢুকল। মধু সঙ্গে করে ভিতরে ছোট উঠোনে নিয়ে গেল। বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে গরম জল করতে বলল। নিজে গেল বাজারে। কিছু খাবার, কার্বলিক সাবান, ছোবা, তুলো, ডেটল, মলম, ট্যাবলেট, শাড়ী, ব্লাউজ, তোয়ালে কিনে নিয়ে এল। তারপর নিজেই মেয়েটার গায়ে গরম জল ঢেলে সাবান ছোবা ঘসে ঘসে আচ্ছা করে চান করাল। কালি-ময়লা ধুয়ে গিয়ে শ্লেট রঙের লাবণ্যময় বর্ণ বেরিয়ে এল। গা মুছিয়ে দিয়ে শাড়ী ব্লাউজ পরিয়ে চাকরের ঘরে বিছানা পেতে শুইয়ে দিয়ে খেতে দিল। আর নিজেই পাটা ব্যাণ্ডেজ করে দিল।

মাস ছয়েক পরে একদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে চান করে ধোয়া পাঞ্জাবী পরে মধু ওর শোবার ঘরে বেতের চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। দুর্গা চা আর জল খাবার নিয়ে এল।

মধু বলল, আলোটা জ্বেলে দে।

নিয়ন ঝলকে উঠল। মধু দেখল দুর্গাকে। দুর্গা কি অপরূপ হয়ে উঠেছে! কাঁধ পর্যন্ত ঘনকালো রুক্ষ চুল। সুন্দর মুখে কপালের খয়েরি টিপটি পূর্ণচাঁদের মতো মিষ্টি। হালকা সবুজ রঙের চমৎকার শাড়ী পরণে। খালি হাত দুটি নিটোল, মোলায়েম, সুন্দর। আঙুলগুলি দীর্ঘ, সুঠাম। মধুর মনে হল, সে নিজেও অনেক পালটে গেছে। মেয়েমানুষ নিয়ে বাঁদরামি করতে আর তার ভালো লাগে না। দুর্গার কুৎসিত অভিজ্ঞতা সে জেনেছে। সে কি দুর্গার প্রেমে পড়েছে? জানে না ঠিক, আরও দিন যাক, বোঝা যাবে। তবে দুর্গাকে ভোগ করার কথা ওর মনে হয় না, ওকে ভালো লাগে, মায়া হয়।

মধু বলল, দুর্গা তোর বিয়ে দোব, পাত্র খুঁজছি।

দুর্গা বলল সুরেলা গলায়,—আমি বিয়ে করব না। তোমার কাছে থাকব। সারাজীবন। ঝি হয়ে।

—ঝি হয়ে?

—ঝিয়ের দরকার নেই?

—তা কি করে হবে? তোর সাধ নেই?

—আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

চোখে আঁচল দিল দুর্গা।

আকাশে পিঞ্জর

কলিং বেল বেজে উঠল। থেমে গেল। ইরা গ্রাহ্য করল না। যে ডাকছে এই সময়ে দুপুরবেলায় সে সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবে। আজ রবিবার নয়, ছুটির দিন নয়, জানা উচিত বাড়িতে ইরা একা আছে। এই দুপুরে এসে ডাকাডাকির মানে কি? ইরা ঠিক করে ফেলল, ও উঠবে না। কিন্তু বেল আবার বেজে উঠল। এবার একটু বেশিক্ষণ বাজল। আবার থেমে গেল। দোতলায় এই নির্জন ফ্ল্যাটে ইরা এখন একা। উপরে আর একটা ফ্ল্যাটে বাড়িঅলা থাকে, নীচে আরও দুটি পরিবার। বেশি বেল বাজলে ওরাই হয়তো বিরক্ত হয়ে এসে লোকটাকে জেরা করবে। আবার বেল বেজে উঠল। এবার অনেকক্ষণ ধরে বাজল। হয়তো বিশেষ কোনো দরকারে কেউ এসেছে। হয়তো পিয়ন এসেছে রেজিষ্ট্রি চিঠি বা মানিঅর্ডার নিয়ে। অগত্যা উঠল ইরা!

ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রীলঘেরা বারান্দা পেরিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকল। বাইরের দিকের জানলাটা খুলে বলল, কে?

যে বেল বাজাচ্ছিল সে সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ইরার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ও। একটা আনক্যানি ফিলিং সমস্ত শরীরকে ঝাঁকানি দিয়ে তরতর করে বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল।

খানিকক্ষণ ওরা কেউ কথা বলতে পারল না। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইরার চোখে ভয়, আতঙ্ক, বিরক্তি, আনন্দ। আর তার চোখে মুগ্ধতা, অস্বস্তি, আনন্দ, জিজ্ঞাসা।

ইরা বলল, তুমি?

হ্যাঁ, আমিই তো, একবার না এসে পারলাম না, আসতে বড় ইচ্ছা হল, দেখতে বড় ইচ্ছে হল।

ইরা চুপ করে রইল। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। ওকে চলে যেতে বলবে, নাকি দোর খুলে ঘরে এনে বসিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে বিদায় দেবে? ওকে ডেকে ঘরে নিয়ে যেতে দারুণ লোভ হচ্ছে। কিন্তু এক বিচ্ছিরি নোংরা ভয় ওকে ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সে বলল, কি হল? এমনি করে দাঁড় করিয়ে রাখবে? একটু বসতেও বলবে না নাকি?

ইরা যেন যন্ত্রচালিতের মতো দরজা খুলে ধরল, বলল, এসো।

ও ঢুকল। ইরা দরজাটা বন্ধ করল। তারপর কোনো কথা না বলেই চলতে লাগল। ইরার পাশে পাশে সে। তাতে দুজনেই রোমাঞ্চিত। ইরার সহসা মনে হতে লাগল, যেন পাখি-ডাকা কোন ফুলে ছাওয়া অরণ্যে কবে কখন ও বেড়াতে গিয়েছিল বসন্তের দিনে, পুরোনো দিনের অনেক ভুলে যাওয়া সেই অনুভূতি আবার যেন নতুন করে উদাস দুপুরের মতো হাহাকার করছে।

ওরা ইরার শোবার ঘরে এসে পৌঁছল।

ইরা অস্ফুটে বলল, বসো।

মানুষটা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো ইরাদের বিছানাতে গিয়ে বসল।

ইরা গম্ভীরভাবে একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, অভীক, শেষপর্যন্ত তুমি আমার স্বামীর বাসাতেও ধাওয়া করলে? আত্মসম্মান জ্ঞান তোমার এত কমে গেছে?

কিন্তু কথাটা বলে ও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেল। অভীকের চিন্তিত ক্লান্ত মুখ একেবারে লজ্জায় ছাই হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে ও তাড়াতাড়ি সামলেও নিল।

এদিকে পৃথিবীতে এখন বসন্তকাল। ইরার ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যাচ্ছে একসারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ ফুলে ফুলে নীল আকাশকে রাঙা করে দিয়েছে। ইরার জানলার পাশ দিয়ে বোগেনভিলায়া লতিয়ে উঠে গেছে, জানলায় লাল ফুলের নিমন্ত্রণ গিয়েছে রেখে। সামান্য দূরে আমবাগান। কান পেতে চুপ করে থাকলে মৌমাছির অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যাবে। কোকিল ডেকে ডেকে উঠছে। বাতাসের ঝরঝর এলোমেলো শব্দের ক্লান্তি নেই।

ইরা ড্রেসিং টেবিলের সামনে একমাত্র বেতের চেয়ারটাতে বসল। অভীকের দিকে তাকিয়ে দেখল। অভীকের চোখ তো ইরার দিকে প্রথম থেকেই পড়ে আছে। ও চোখ দুটিকে কিছুতেই যেন স্থানভ্রষ্ট করা যাবে না। ইরা সেই চিরপরিচিত মূর্তিটি দেখল। নতুন জীবনের পর্দাটা যেন প্রবল ঝড়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। লম্বা দোহারা চেহারা। শ্যাম রং। মাথায়

বড় বড় একরাশ চুল আগুনের মতো বিপর্যস্ত লেলিহান। টানা টানা ঘন ভুরুর নীচে তেমনি সম্মোহিনী দুটি ভাসা ভাসা চোখ ছায়াতে-আলোতে কুহকে ভরা।

অভীক ভাবছে, এই সেই মেয়ে, ওর কৈশোরে যৌবনে মেয়ে বলতে ওকেই শুধু চিনে এসেছে। ছিপছিপে লম্বা। শরীরের গড়নই অমনি, কিন্তু রোগা যে নয়, সে ওর ময়ালের মতো নরম নিটোল বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। মাথায় ঝর্ণার মতো চুল। আশ্চর্য দুটি চোখ, একটু ছোটো, কিন্তু নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল, প্রতিটি ভাবের লীলায় ঝকঝকে আয়নার মতো। নরম পুরু পুরু কমলালেবুর কোয়ার মতো দুটি ঠোঁট। বেপরোয়া ঢেউ উঠেছে শরীরে। সরু কোমর, নিম্ন বিশাল। হাঁটায় চলায় একটি বিচিত্র ছন্দ যেন মনকে টানে। ফর্সা রং, কচি কলাপাতায় যেন বিকেলের রোদ পড়েছে। ওর নতুন বিয়ে হয়েছে তাই দুপুরবেলাতে ঘরে থেকেও সিল্কের শাড়ি পরে আছে, তাতে নানান রংয়ের ফুল ছড়ানো। ফুলের রংয়ের ব্লাউজ ওর গায়ে।

ইরা বলল, কেমন আছ? কি খবর বলো।

—কেমন আছি? ভালো নেই, একেবারেই ভালো নেই। আর নতুন খবর কিছু নেই। সেই বিধবা মা, বিয়ের যুগ্যি বোন, দুটো ছোটো ভাই। বোন মাস্টারি করে, আমি টিউশনি করি। এই খবর।

সুজাতা এখনও মাস্টারি করছে?

—তা না হলে কি করবে? আমি বলেছি বিয়ে হলেও তুই চাকরি ছাড়বি না।

—তোমার মত আমি জানি, চাকরি না করলে নাকি মেয়েরা স্বাধীন হয় না।

—শুধু জানো তাই নয়, সে মত তুমিও মানতে।

ইরা জবাব দিল না, চুপ করে রইল। মুখ ফিরিয়ে একবার ও ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকাল। আয়নাতে অভীককে দেখা যাচ্ছে। অভীক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখাচোখি হয়ে গেল।

অভীক বলল, আমি কটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আসা নিরর্থক জেনেও না এসে পারলাম না। কে যেন আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে এল।

—আমি জানতাম, তুমি আমাকে সহজে ছাড়বে না। কিন্তু পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে পারতে।

—কবে দেখা হবে, না হবে, জানি না। আমি যেখানে আছি সেখানে যাবার সাহস কি তোমার হত? আর তাছাড়া এখনই ইচ্ছে হল, পরে যদি এই ইচ্ছে মরে যায় সেই ভেবে চলে এলাম।

—এই দুপুরবেলায়? ও বাড়িতে নেই বুঝে?

—ঠিক তাই, ওসব নীতিবাক্যে ভড়কে যাবার মতো মন আমার নেই। আর তোমার কাছে আমার নীতি কি? ন্যায়তঃ তুমি তো আমারই স্ত্রী। কেননা সেই কবে থেকে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি। এই ভালোবাসার দাবীতে আমি তোমার কাছে যখন খুশি আসতে পারি।

ইরা কোনো কথা বলল না। এই কথাহীন স্তব্ধতার মধ্যে ফ্যানের বাতাস কাটার শব্দ নিভৃত গোপন কথার মতো দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা কুটে মরতে লাগল।

অভীক আবার বলল, কেন এই ভীষণ কষ্ট তুমি আমাকে দিলে? তোমার কাছে আমি কী অপরাধ করেছিলাম!

—কষ্ট আমার নেই?

—তাতো থাকবেই। তাহলে এত কষ্ট, সারাজীবন ধরে যা ভোগ করতে হবে সেই কষ্ট কেন দিলে, কেন নিজে নিলে?

অভীক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইরার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। সিল্কের আঁচল দিয়ে চেপে চেপে সেই জল মুছে খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, বাড়ির লোকে দিনরাত বিরক্ত করতে লাগল। তুমি কিছুতেই চাকরি পেলে না।

—তাতে কি? চাকরি না পাই, কিছু একটা করতাম নিশ্চয়ই।

ইরা তীব্র অনিচ্ছাকে কঠিন চেষ্টায় কাটিয়ে উঠে আবার বলল, বাড়ির লোকে বলতে লাগল, ভালো ছেলে, ভালো চাকরি করে, দেখতে শুনতে ভালো, দেশে জমি-জায়গা অনেক আছে; কথা শোন্, সুখে থাকবি; আমি, আমি আর পারছিলাম না।

—এখন সুখে আছ?

—জানি না।

—কেন, জানো না কেন? সুখ দুঃখ বুঝতে পার না?

—না।

—আমি জানি, সুখ অত সস্তা নয়। সুখ সংগ্রামে, জয়ে, স্বাধীনতায়।

আগুনের ছেঁকার মতো প্রশ্ন করল অভীক, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসো ?

—ওকথা বোলো না, বোলো না, ওকথা।

অভীক কথা বলল না। বেদনাময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ইরা বলল, আমি জানি না ভালোবাসি কিনা। মাত্র একমাস বিয়ে হয়েছে, কেমন করে বুঝব ?

—ভালোবাসা তীব্রতম অনুভূতি। ভালোবাসো না, কেননা ভালোবাসা জীবনযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সঙ্কটে দুঃখে খাঁটি ভালোবাসা পরীক্ষা দিতে ভালোবাসে।

একটু থেমে বলল, আচ্ছা, একটা অজানা অচেনা মানুষের কাছে এত তাড়াতাড়ি কেমন করে, আমি বুঝতে পারি না !

ইরা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, থাক, ওসব কথা থাক, তুমি অন্য কথা বলো।

একটু চুপ করে থেকে অভীক বলল, এত একা লাগে, এত অসহায় ! এই ভীষণ কষ্ট আমি কেমন করে ভুলব ! আমি বাঁচব কেমন করে !

ইরা নীরব হয়ে রইল। কান্না ঠেলে আসছে ওর বুকের মধ্যে। অসংখ্য স্মৃতির সুধা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো দুলে দুলে উঠছে রক্তের ভিতরে।

অভীক বলল, তোমাকে নিয়ে আমার কতবড় অহঙ্কার ছিল, আমার সেই অহঙ্কারও তুমি ভেঙ্গে গুড়িয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে কেন ?

কেন, এই প্রশ্ন ইরার মনের ভিতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে হৃদয়ের সব সুখ-শান্তি ধ্বংস ভ্রংশ করে মহাকালের গম্ভীর ভয়াবহ বিষাণ-ধ্বনির মতো পাক খেয়ে খেয়ে মাথা কুটে কুটে মরতে লাগল।

অভীক বলল, তুমি কি একথা মানো না ইরা যে ভালোবাসাই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের একমাত্র শর্ত হওয়া উচিত ?

ইরা মিনতি করে বলল, তুমি চুপ করো, চুপ করো, আমি ছোটো, হীন, সাধারণ, আমি তোমার সব কথা মানতাম, আজও মানি, কিন্তু আমি পারি নি, হেরে গেছি।

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ইরা হঠাৎ বলল, অভীক, এবার তুমি এসো, ও হয়তো এসে পড়বে।

—তাতে কি? এলেই বা? আমি কি চুরি করতে এসেছি? এলে আলাপ হবে। তোমার বিয়ের সময় ছিলাম না, আলাপ পরিচয় হয়নি।

—না না, আমার ভয় করছে, আমি ওকে যতটা চিনেছি, ভীষণ হিংস্নুটে।

—তার মানে তোমার উপর বিশ্বাস নেই অথচ শরীরের চাহিদা—

—অভীক, ছেলেমানুষী করো না।

—ইরা, ভালোবাসা থেকে যে শিশুর জন্ম হয় না, তাকেই জারজ বলে।

—অভীক আমাকে এবার রেহাই দাও, ওসব কথা শুনে আর কোনো লাভ নেই, সবাই যা করছে তাই করেছি। মা-বাবা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে তাকেই মেনে নিয়েছি, কি করব বলো!

—কিন্তু বিয়েটা তোমার মা-বাবা করেনি, তুমি করেছ। কত বড় দুঃখ থেকে পাগলের মতো এত কথা আমি বলছি তুমি যদি বুঝতে।

—বুঝছি, বুঝতে পারছি, আমার বুকের ভিতরে কি যে হচ্ছে তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে, আমার প্রতি করুণায় তোমার মন ভরে যেত। যাক গে, যা হয়ে গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না, সে সাহস, সে ক্ষমতা, সে তেজ আমার নেই, আমি দাসখতে নাম সই করেছি। অভীক, এবার তুমি এসো।

অভীক উঠে দাঁড়াল। একবার ইরাকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে দরজার কাছে গেল। ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে উঠল। ভয়ে ইরার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। গলা যেন ভেঙে গেল ওর। বলল, সর্বনাশ! ও এসে পড়েছে!

—তাতে অত ভয় পাবার কি আছে?

অসহিষ্ণু বেল বেজেই চলেছে। সে বোধহয় ভেবেছে ইরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বেল থামল। তারপর অধৈর্য গলা ভেসে এল, এই, এই শুনছ, আমি নীরেন, দরজাটা খুলে দাও।

মুখ সাদা হয়ে গেছে ইরার। অভীকের দুটি হাত ধরে বলল, অভীক, আমি এখন কী করব? কী করব তুমি বলো?

অভীক বিরক্ত হয়ে বলল, কী আবার করবে? দরজাটা খুলে দিয়ে এসো। অমন করছ কেন? কি হয়েছে কি?

গলার স্বর নিচু হয়ে এসেছে ইরার, ফিসফিস করে বলল, তুমি জানো না ও ভীষণ রাগী, তুমি জানো না, ছেলেরা কি ভীষণ হিংস্নুটে হয়, কি ভীষণ

হিংস্র হয়, তুমি আমার একটা কথা রাখো অভীক।

—কি কথা ?

—তুমি অন্য কোনো দিক দিয়ে পালাও। কোনদিকেই বা পালাবে ? কোথাও পালাবার জায়গা নেই। এটা একটা খাঁচার মতো বাড়ি। তুমি, তুমি কিছু মনে কোরো না, এই খাটের তলায় লুকিয়ে পড়।

—কী বলছ তুমি !

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার কথা শোনো, একটু পরে ওকে আমি বাইরে পাঠাব, তখন তুমি বেরিয়ে চলে যাবে।

—না, আমি খাট-ফাটের তলায় ঢুকতে পারব না।

ওদিকে আবার কলিং বেল বেজে উঠল, বেজেই চলল, সেই সঙ্গে চীৎকার আসছে, এই, এই, আচ্ছা ঘুম তো, ওঠো, আমি নীরেন। শুনছ, এই।

ইরা অভীকের হাতদুটো ধরে টানতে টানতে বলল, অভীক, আমাকে বাঁচাও, আমার কথাটা শোনো, তুমি খাটের নীচে যাও।

—তুমি একটা শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে, কি ইয়ার্কি হচ্ছে কি ?

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি অভীক, আমি ঘরের বৌ, দুপুরে একা গল্প করছিলাম অন্য পুরুষের সঙ্গে, ও জানতে পারলে সারাজীবনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

—এই সামান্য কারণে !

পাগলের মতো বলতে লাগল ইরা, তুমি জানো না, ওরা মস্ত জমিদার বংশ, ভীষণ রক্ষণশীল, ওর বাবা এক মেয়েকে প্রেম করার জন্যে গুলি করে মেরেছিল, অভীক প্লিজ, তুমি একটু লুকোও, আমাকে যদি ভালোবাসো, আমার সুখের জন্যে একটু লুকোও।

ওদিকে দরজায় এবার ধাক্কা পড়ছে। কলিং বেলের উপরে আর সে ভরসা রাখতে পারছে না।

অভীক কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়ল। ইরা ওর হাত ধরে টানতে লাগল। ওকে জোর করে বসিয়ে দিল। ওকে ঠেলতে লাগল খাটের নীচে যাবার জন্যে। অভীক নীচু হয়ে খাটের তলায় ঢুকল। ইরা ওকে ঠেলে দিয়ে বলতে লাগল, আর একটু ভিতরে যাও লক্ষ্মীটি।

ইরা ভালো করে খাটের ধারটা দেখল অভীককে দেখা যাচ্ছে কিনা। তারপর দ্রুত কম্পিত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল।

নীরেনের মুখ রাগে বিরক্তিতে থমথম করছে। বলল, এত ঘুম তোমার? কখন থেকে ডাকাডাকি করছি।

—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এসো রাগ কোরো না। তুমি এত তাড়াতাড়ি আসবে জানব কেমন করে বলো। এসো।

নীরেন দরজা বন্ধ করে ইরাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকল। ইরা আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে পেল। কেমন যেন বিবর্ণ, ভীত, সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। আয়নার কাছে গিয়ে পাউডারের পাফটা নিয়ে মুখে বুলিয়ে নিল। এবং আয়নার নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেল আয়নাতে খাটের তলায় অভীকের গায়ের জামার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ভয় পেল ও। ভয়ে সর্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল।

নীরেন ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। সজোরে চুমু খেয়ে বলল, মাইরি একদিনও দিনের বেলা তোমার ন্যুড ফিগারটা দেখতে পেলাম না। আজ দেখব।

চমকে উঠল ইরা, বলল, না, না, আজ নয়।

—কেন আজ নয় কেন? এমন ফার্স্ট ক্লাস বাসা। আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। লজ্জাটা কি?

—না, না, আজ নয়, আমার ভীষণ লজ্জা করবে।

ইরাকে চটকাতে চটকাতে নীরেন বলল, বা: অফিসে এই প্ল্যান হঠাৎ মাথায় এল, মাথা গরম হয়ে উঠল, তাই কাজকর্ম ফেলে ছুটে এলাম। কেন আজ হঠাৎ তোমার এত আপত্তি কেন বলো তো?

—না, না, এখন নয়।

অনুনয়ে ভেঙে পড়ল ইরার গলা।

নীরেন বাধা পেয়ে ক্ষেপে উঠল, না, এখনই। আমি তোমাকে ল্যাংটো করব তারিয়ে তারিয়ে দেখব।

বিচিত্র ইশারায় ভুরু নাচাল নীরেন, যা জিনিস তুমি মাইরি, বাইরে থেকে কতটুকু তার বোঝা যায়!

—অমন করে বোলো না, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

—কেন হঠাৎ হল কি তোমার?

ইরাকে আরও জোরে চটকাতে শুরু করল নীরেন। ইরা হঠাৎ দারুণ লজ্জা পেল। নীরেনকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল। নীরেন আশ্চর্য হল,

কেঁপে গেল। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ইরাকে দেখে বলল, দিতেই হবে, আমি যা বলছি তাই করব।

সে ইরাকে উলঙ্গ করবার জন্যে ওর কাপড় ধরে হ্যাচকা টান মারল। বুকের বসন খসে পড়ল। তারপর দুঃশাসনের মতো টানাটানি শুরু করল নীরেন। ইরা হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল, চীৎকার করে উঠল, না, অমন কোরো না।

—কেন করব না? তুমি আমার বিয়ে করা বৌ নও? আমি কি অন্যায় কিছু করছি? আমি তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করব।

—প্লিজ এখন নয়, অন্তত তুমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

—না, আমি এখন বাথরুমে যাব না। আগে এইসব তারপর বাথরুম যাব।

আবার এক হ্যাচকা টান মারতেই ইরার কাপড় কোমর থেকে খুলে গেল। ইরা ছুটে পালায় ঘরের কোণে। নীরেন গিয়ে ওর বুকের কাছে ব্লাউজ ধরে হ্যাচকা টান দিল।

ইরা চীৎকার করে উঠল, না, না, প্লিজ এখন নয়।

—না, এখনই।

ইরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল, ছেড়ে দাও বলছি, পশু কোথাকার!

—কি? যা মুখে আসছে তাই বলছ যে, এত তেজ কেন তোমার, ব্যাপারটা কি?

বলে টান মারতেই ব্লাউজ ফরফরিয়ে ছিঁড়ে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ইরা নীরেনকে ঠেলে দিল। নীরেন আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে ঠোক্কর খেল। তারপর উন্মত্তের মতো ছুটে যেতে গেল ইরার দিকে। ইরা ড্রেসিং-টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীরেন কাছে আসছে দেখে স্নোর শিশি ছুড়ে মারল। নীরেনের মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে শিশিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারপর পাগলের মতো ইরা ড্রেসিং-টেবিলের উপরে রাখা প্রসাধনের সমস্ত শিশি বোতল কৌটো নীরেনের দিকে ছুড়তে লাগল। নীরেন ওকে জাপটে ধরতে গেল, ইরা ঘরের উল্টো দিকে চলে গেল, হাতে ওর ওডিকোলনের শিশি। আয়নার কাঁচে অভীককে সামান্য দেখা যাচ্ছে ও দেখল, তাই নীরেনকে

আরবার ছল করে আয়নার নীচের দিকে শিশিটা ছুড়ে মারল। আয়নাটা ফেটে গেল, ভেঙে পড়ল না।

এবার নীরেন চীৎকার করে গালাগালি শুরু করল, কুত্তি কাঁহিকা, হারামজাদী, দেখি আজ মাগী তোর তেজ কত। আমাকে আমার প্রাপ্য যখন খুশি আদায় করে নিতেই হবে।

ইরা চীৎকার করে বলতে লাগল এসো না দেখি একবার। ভালো কথা শুনতে চায় না। আমি ক্রীতদাসী? কামুক রাক্ষস কোথাকার।

—আর তুমি সন্ন্যাসিনী। তুই কামুক নোস? তোকে আমি দেখছি না? আমার চেয়ে তোর কাম ঢের বেশি।

—হ্যাঁ বেশি, তাই বলে দিন দুপুরে আমি অফিস থেকে ষাঁড়ের মতো ছুটে আসি না।

—হ্যাঁ রে কুত্তি, আমি কামুক, আমি তোকে ছাড়ব না।

ছুটে গিয়ে ইরাকে জড়িয়ে ধরল নীরেন। ইরা চীৎকার করে উঠল, ছাড়ো আমাকে, বেরোও বলছি।

ওদের চীৎকার জিনিসপত্র ছোঁড়ার শব্দ এই দোতলা বাড়ি এবং আশে-পাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছিল। ওরা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল, কী হয়েছে? দরজা খুলুন, বৌদি, বৌমা, কী হয়েছে? নানান কণ্ঠের জিজ্ঞাসা উচ্চকিত হয়ে উঠল। দরজায় দুম্‌দাম্‌ ধাক্কা পড়তে লাগল। কলিং বেল তীব্র চীৎকারে বাজতে লাগল।

অগত্যা নীরেন ইরাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, কাপড়টা পরে নাও তাড়াতাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজটা ঢেকে নিও। দেখি কি ব্যাপার।

ওদিকে খাটের নীচে অভীক গরমে বিরক্তিতে রাগে লজ্জায় ভয়ে ঘামছে। লজ্জায় ঘেন্নায় ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে এখন আর কিছু করবার উপায় নেই।

নীরেন দরজা খুলে লোকগুলিকে বোঝাতে চেষ্টা করল, কিছুই হয়নি।

কিন্তু নীরেনকে অগ্রাহ্য করে কয়েকজন উৎসাহী ছেলে ভিতরে ঢুকে গেল। বলল, বৌদি, কি ব্যাপার, অমন করে ককিয়ে উঠলেন কেন?

ইরা তখনও নিজেকে সামলাতে পারে নি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ যারা নীরেনের কথা প্রায় বুঝে আসছিল তারা ইরার আর্ত কান্না

শুনে নীরেনের সঙ্গেই ছুটে ভিতরে এল। ঘরে লোক ভরে গেল।

বয়স্করা বোঝাতে লাগল, কেঁদো না, কি হয়েছে? স্বামীস্ত্রীতে অমন ঝগড়া হয়ই।

ইরা বললে, না, না, ঝগড়া নয়, কিছুই হয়নি।

উৎসাহী যুবকরা সুন্দরী নারীর কান্না সহ্য করতে পারে না। ওরা বলছে, তাহলে কি হয়েছিল। ঘরের এরকম অবস্থা কেন?

নীরেন বলল, কে জানে ভাই, আমি মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না; কেন যে ও আজকে পাগলের মতো কাণ্ড করল, কেন যে কাঁদছে?

হঠাৎ ইরার চোখ পড়ল, বাড়িওয়ালা বুড়ো, দারুণ ধুর্ত যার মুখ, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে।

ইরা বলল, লোক জোটাবার জন্যেই আমি অমন করছিলাম।

—কেন, লোক জোটাবার জন্যে কেন?

—ও আসার পর আমি আয়নার সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম।

—কী দেখলে?

তিতো ওষুধ খাওয়ার মতো করে ইরা বলে ফেলল, ভাবলাম হয়তো লোকটার কাছে ছোরাটোরা আছে। ওকে যদি ছোরা মেরে বসে, একা মানুষ ও, তাই।

নীরেন আশ্চর্য হয়ে বলল, লোক কোথা? লোক ঢুকবে কেমন করে?

ইরা বলল, আমি বাইরের দরজা খুলে একটু আগে ছাদে গিয়েছিলাম কাপড় মেলতে, তখনই হয়তো—

নীরেন বলল, এই এক মুস্কিল, ছাদের সিঁড়িটা বাইরে।

ছেলেরা বলছে, কিন্তু লোকটা কই!

বাড়িওয়ালা বুড়ো বলল, আয়নায় দেখুন খাটের নীচে কে যেন লুকিয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে অতগুলো লোক হুমড়ি খেয়ে নীচু হল, আরে তাইতো, তাইতো।

তারা টেনে হেঁচড়ে অভীককে বাইরে বার করে আনল। অভীক চকিতে একবার ইরার মুখের দিকে তাকাল। ইরার চোখে ভয়, লজ্জা, বেদনা, অশ্রু। প্রচণ্ড পেটন শুরু হয়ে গেল।

নীরেন বলল, বাইরে চলুন, বাইরে নিয়ে চলুন।

নীরেনও বাঘের মতো ঘুঁসি ঝাড়তে থাকল অতীককে। বেদম পিটতে পিটতে ওকে নীচে নিয়ে গেল ওরা। ইরা জানলার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। জানলার নীচেই বাড়ির গেটের সামনে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, সেখানেই কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলি ফুলে ফুলে চারদিক আলো করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দেখল, ওরা অতীককে মেরে রক্তাক্ত করে দিল। অতীকের একটা চোখের ভুরুর কাছটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, চোখটা লাল হয়ে উঠেছে। গালে রগে নীল নীল কালসিটে পড়েছে। কপালের একদিক ফুলে গেছে। জামাটা ফালা ফালা হয়ে শরীরে ঝুলছে, প্যান্টটাও আস্ত নেই, তখনও মারের বিরাম নেই।

ইরা আচমকা শুনল, অজ্ঞান হয়ে গেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে!

তাকিয়ে দেখল, অতীক চিৎ হয়ে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরে মাটিতে পড়ে আছে। সবাই গোল হয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছেলে গিয়ে বালতি করে জল নিয়ে এসে ওর মাথায় মুখে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ওর জ্ঞান হতেই সবাই চ্যাংদোলা করে ওকে তুলে নিয়ে থানায় চলে গেল। নীরেনও সঙ্গে গেল।

ইরা কাঁদতে কাঁদতে ঘর পরিষ্কার করল। বাথরুমে গিয়ে গা ধুয়ে এল। ভাঁজ-করা নতুন শাড়ি ব্লাউজ পরল।

সন্ধ্যেবেলায় হন্তদন্ত ঘর্মাক্ত ক্লান্ত হয়ে নীরেন ফিরে এল। অফিসের পোশাক তখনও ওর গায়ে। বলল, দাঁড়াও, আগে চান করে আসি।

চান করে ঘরে এসে পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরে গলায় গায়ে পাউডার ছড়িয়ে চুল আঁচড়ে বিছানায় বসে বলল, উঃ, তোমার বুদ্ধি বলিহারী! আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, তুমি অমন করছ কেন? এত ফুর্তিবাজ মেয়ে তুমি, এত ফ্রী, এত জলি, তোমার গায়ে হাত দিলেই তোমার শরীর রিএ্যাক্ট করে, তুমি অমন করছ কেন? কি আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি তোমার!

হেসে লুটিয়ে পড়ল নীরেন, ইরার চিবুক ছুঁয়ে বলল, পাগলী একেবারে।

খুশি মনে তৃপ্তির সঙ্গে ফের বলল, বাছাধন আচ্ছা শিক্ষা পেয়েছে, দিয়ে এলাম হাজতে পুরে।

একটু থেমে বলল, একটা হোলটাইম ভালো ঝি কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, কি যে মুস্কিল হয়েছে!

তারপর সজ্জিত সুন্দর ইরাকে দলিত-মথিত করে উদ্দাম হয়ে উঠল। নিষ্ঠুরভাবে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারংবার ভোগ করল ইরাকে।

মাঝ রাত্রে উচ্ছৃঙ্খল অপরিমিত রতিক্লান্ত নীরেন অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছিল। ইরা বিছানা থেকে উঠে এসে জানলার দিকে মুখ রেখে মেঝেতে লুটিয়ে বসল। সমস্ত শরীরে ওর ক্লান্তি, যন্ত্রণা। বিবেকের শকুনিরা ওর মৃত মন নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। চোখে ফোয়ারার মতো জল ঝরছে ওর। হাজতে আটক আহত অভীকের দুঃখ আর ঘৃণা মেশানো মুখ চোখের সামনে ভাসছে।

বাইরে চৈত্রের খ্যাপা রাত্রি অন্ধকারে গাছে পাতায় বাতাসের ঝাপটা মেরে মেরে মাতাল তান্ত্রিকের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর খল খল হাসি আর পদধ্বনি যেন আকাশে আকাশে পড়ছে ছড়িয়ে। জোনাকিরা অগ্নি-ফুলকির মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে, যেন কোথাও আগুন লেগেছে। ইরার মনে হল, এই সোনার পিঞ্জিরায় ও আমৃত্যু বন্দী থেকে বিবেকের চাবুক সইবে, স্বামীকে সত্যিকার ভালো কখনো বাসতে পারবে না। জীবনে সেই সুধার স্বাদ ও কখনো পাবে না, মনের মানুষকে ভালোবেসে জীবন-সংগ্রাম করে যে সুধার স্বাদ পাওয়া যায়। কঠিন সংগ্রামের সঙ্গেই সুধা মিশে থাকে, নিছক সুখের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

রাজরোগ

মৃন্ময়বাবু বললেন, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না মশাই, মনে হয়, অনেকদিন তো বাঁচলাম, আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না!

মৃন্ময়বাবুর বয়স হয়তো চল্লিশ পেরিয়েছে। সুন্দর চেহারা। ব্যক্তিত্ব মাখানো মুখ। মাথার চুল হালকা হয়ে এসেছে। মোটা ফ্রেমের চশমা মুখখানাকে বয়সের তুলনায় বেশি গম্ভীর করেছে।

আমরা বসেছিলাম চার্চের নির্জন দীঘির পূব পাড়ে। পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ বিকেলের নরম নীল আকাশে যেন রঙের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। দক্ষিণের উদ্দাম বাতাসে দীঘির টলটলে স্বচ্ছ জলে ছোটো ছোটো ঢেউ জেগেছে। সেই ঢেউ পাড়ে এসে ধাক্কা খেয়ে স্নিগ্ধ কলধ্বনিতে ভেঙ্গে পড়ছে। চারদিক নিরিবিলি নির্জন। নির্জনতার রহস্যময় এক সুরেলা ছন্দ অনুভূতির গভীরে যেন বাজে।

মৃন্ময়বাবু আবার বললেন, দেখুন, হিসেব করে দেখলে ভালোই তো আছি। সরকারী চাকরি করি, সুন্দরী বৌ, দুটো ছেলেমেয়ে, অভাব-অভিযোগ নেই, তবু কেমন জীবন শূন্য লাগে, নিজেকে বড্ড তুচ্ছ আর সাধারণ মনে হয়।

বললাম, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ যখন সাধারণ হয়েই বেঁচে আছে তখন সাধারণ হওয়াটা তো তুচ্ছ বলা যায় না, তাতে জীবনের ওপর ভালোবাসা কেন নষ্ট হবে!

মৃন্ময়বাবু বললেন, তা ঠিক, আমি নিজেও কোনোদিন অসাধারণ কিছু হতে চাই নি, কিন্তু সাধারণ বলেই আমার মধ্যে স্বাভাবিক ন্যায়পরায়ণতা থাকা চাই, এমন কোনো কাজ করা আমার উচিত হবে না, যার জন্যে আমাকে সারা জীবন অনুতাপ করতে হয়, লজ্জা পেতে হয়। আসলে ব্যাপার কি জানেন, সাধারণ মানুষই বিলাপ করতে চায়।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে উনি চুপ করে রইলেন, তারপর লাজুক হাসি হেসে বললেন, আপনাকে আমার জীবনের একটা ঘটনা বলতে চাই, শুনবেন! এ আমার প্রথম যৌবনের ঘটনা, কখনো কাউকে বলি নি।

আমি বললাম, বেশ তো, বলুন শুনি।

আবার কতক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। আসল ঘটনাটা বলবার আগে দু-একটা কথা সংক্ষেপে বলে নিতে হবে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কথা না বলে অপেক্ষা করে রইলাম।

মৃন্ময়বাবু বললেন, আমাদের পরিবারে খুব গোঁড়ামি আর অহঙ্কার ছিল, জানেন। জমি আর টাকা থাকলেই গোঁড়ামি আর অহঙ্কার থাকে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন আর টাকা বা সম্পত্তি তেমন কিছু ছিল না আমাদের, কিন্তু পুরোনো স্বভাবটা তখনও বজায় ছিল। আমি তখন বি-এ পাশ করে বছর তিনেক বেকার হয়ে আছি। আমার বাবা আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। মাথার ওপর ছিল জেঠামশাই, কাকা, বিধমা মা আর দাদারা। দাদারা চাকরি-বাকরি করতেন। থিয়েটারে ঝোঁক ছিল আমার। পাড়ার ক্লাবে দিন-রাত পড়ে থাকতাম। থিয়েটারের রিহার্সাল-টিহার্সাল নিয়ে দিন কেটে যেত। কিন্তু রাত্রি দশটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে আমার নির্জন ঘরে গিয়ে যখন ঢুকতাম তখন এমন একটা নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসত যে কি বলব! জানলার কাছে চুপ করে বসে থাকতাম। কিসের কষ্টে চোখ দিয়ে জল এসে পড়ত। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়ত, 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু কেন প্রাণ কাঁদে রে!'

এইসময় একদিন অবিনাশদা কলকাতা এসে আমাদের বাড়িতে উঠলেন। অবিনাশদা আমাদের কোন আত্মীয় নন। আমার মেজদার বন্ধু। আমার ঘরেই তাঁর শোবার জায়গা হল। রাত্রে আমাকে তিনি শুধোলেন, মৃন্ময়, আমার সঙ্গে এম-পি যাবে?

আমি চুপ করে রইলাম।

অবিনাশদা আবার বললেন, তোমার মেজদা তোমার জন্যে একটা কাজের কথা বলছিলেন; আমার সঙ্গে যেতে চাও তো চলো, যতদিন না ভালো কাজকর্ম হয়, আমার সাহেবকে বলে দেখব, কিছু একটা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, যাব, অবিনাশদা।

আমার আর কলকাতা ভালো লাগছিল না। বেকার জীবন অসহ্য বোধ হচ্ছিল। নানান জায়গায় দরখাস্ত করি, জবাব আসে না। কতদিন আর ওভাবে থাকা যায়!

অবিনাশদা ছিলেন অবিবাহিত। আমি শুনেছিলাম, উনি মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান। রুগ্ন মা-বাবা আর তিন বোন নিয়ে সংসার। ওঁর চাকরির উপরেই নির্ভর বলে বিয়ে-থা করেন নি। তাছাড়া একটু যেন সাত্বিক ধরণের মানুষ ছিলেন। ধীর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর, শান্ত নম্র মুখশ্রী। ওঁকে আমার বড় ভালো লাগত।

অবিনাশদা বললেন, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে একথা জানিয়ে ওখানে একটা চিঠি লিখে দিই ?

আমি সম্মতি জানালাম।

সপ্তাহখানেক পরে অবিনাশদার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। তু'দিন ট্রেনে কাটিয়ে একদিন বিকেল বেলা মধ্যপ্রদেশের এক স্টেশনে নেমেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওদিকে সন্ধে হতে দেরী হয়। সূর্যাস্তের পরও অনেকক্ষণ আকাশে আলো থাকে। সেই অদ্ভুত আলোয় চারদিকের ছোটো বড় পাহাড় আর জঙ্গল দেখে আমার খুব ভালো লাগল। তখন আমার প্রথম যৌবন। সে বয়সে বুকের মধ্যে কেমন যেন রহস্যময় কোনো বেদনা জমে থাকেই। নতুন জায়গায় ঐ রকম উদার বৈরাগ্যময় দৃশ্য প্রাণের সেই অস্পষ্ট ব্যাকুলতার সঙ্গে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

স্টেশনের বাইরে এসে অবিনাশদা একটা টাঙ্গা নিলেন। জীবনে সেই আমি প্রথম টাঙ্গাতে উঠলাম। আমাদের টাঙ্গার ঘোড়াটা দেখেও আমার বড় ভালো লাগল। সাদা রঙের বেশ বড় ঘোড়া। সুন্দর ঘাড়ের ওপর কাশফুলের মতো চমৎকার কেশর। পিচঢালা রাস্তায় ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি, ঘোড়ার গলায় ঘুঙুরের ঝুম্‌ঝুম্‌ নাচের ছন্দে যেন বাজতে লাগল। তখন সময়টা ছিল বোধহয় গ্রীষ্মকাল। চারদিক শুকনো খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু দুর্বার বেগে হাওয়া আসছিল। আমি ঘোড়ার খুরের সেই শব্দ শুনতে শুনতে সামনের বিশাল গম্ভীর আকাশ, চারদিকের পাথুরে মাটি আর গাছপালা দেখতে দেখতে ভবিষ্যতের অজানা কোন স্বপ্নে যেন বিভোর হয়েছিলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না, এক সময় টাঙ্গা থেমে গেল। অবিনাশদার গলা শুনতে পেলাম, মৃন্ময়, আমরা এসে গেছি।

টাঙ্গা থেকে নেমে দেখলাম, একখানা ছোটো দোতালা বাড়ির সামনে আমাদের টাঙ্গা দাঁড়িয়েছে। বাড়িটা বোধহয় নতুন। সামনে অনেকখানি

জায়গা জুড়ে বাগান, তারের জাল দিয়ে ঘেরা, বাগানের ছোট গেট থেকে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত লাল পাথর ছড়ানো রাস্তা চলে গেছে। এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া কিছু নতুন বাড়ি। তাছাড়া কাঁকর-ছড়ানো রুক্ষ ঢেউ-খেলানো ফাঁকা মাঠ। বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারে ফাঁকা মাঠে কিছু শাল পলাশ বা আমের বড় বড় গাছ এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে।

টাঙ্গা ছেড়ে দিলেন অবিনাশদা। তারপর ছোটো গেট খুলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় কড়া নাড়লেন।

একটু পরে দরজা খুলে চৌদ্দ-পনের বছরের একটি ফ্রক-পরা মেয়ে আমাদের দেখে একটু যেন থমকে গেল।

অবিনাশদা বললেন, শান্তি, এই দেখ্, কে এসেছে, আমাদের মৃন্ময়। ছানু কোথায়?

শান্তি বলল, দিদি মায়ের কাছে আছে।

—এসো

বলে অবিনাশদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

অবিনাশদা ডাকলেন, ছানু—

আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে দাঁড়াল। অপরিচিত আমাকে দেখে একটু যেন সঙ্কুচিত হল।

অবিনাশদা বললেন, ছানু, এই হচ্ছে মৃন্ময়। কোন্ ঘরে ও থাকবে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দে।

বাড়িটার নীচে দু'খানা ঘর, উপরে দু'খানা ঘর। নীচে বাথরুম এইসব আছে, উপরেও আছে। রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা উপরে। ভিতর দিকে ছোটো উঠোন, উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। দোতলার একটা ঘরে থাকেন অবিনাশদার মা-বাবা, আর একটা ঘরে তিন বোন। নীচের একটা ঘর অবিনাশদার, অন্য ঘরটা এতদিন বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত, সেই ঘরটায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

চানটান সেরে আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে মন খুশি হয়ে উঠল। একটি ছোটো তক্তপোষে আমার বেডিং খুলে বিছানা পাতা হয়েছে। ছোট একটি আনলাতে আমার জামা প্যাণ্ট কাপড় সুন্দর করে গোছানো। ঘরের মাঝখানে একটি বেতের চেয়ার, একটি বেতের টেবিল। সব কটি জানলা খোলা। বিকেলের ধূসর আলোয় সমস্ত ঘর ভরে আছে।

ক্যান খুলে দিয়ে আমি বিছানাতে শুয়ে পড়লাম।

মৃন্ময়বাবু হঠাৎ থেমে সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করে আবার বললেন, একটু তন্দ্রামতো এসেছিল বোধহয়, হঠাৎ হালকা পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে দেখলাম, ছানু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘরে উজ্জ্বল নিয়ন জ্বলছে। আমি বিছানাতে উঠে বসলাম।

ছানু খুব অস্পষ্টভাবে একটু হাসল, বলল, আসুন, সকলের সঙ্গে দেখা করবেন তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুমোবেন, আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

ছানুর গলার স্বর খুব সুন্দর। অমন অদ্ভুত মধুর কণ্ঠস্বর আমি এতটা জীবনে আর কখনো শুনি নি। ছানুর কথা আমি এখন আর একটু বলব। ছানু প্রমাণি উচ্চতার মেয়ে। দোহারা সুন্দর গড়ন। ছানুকে ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু ওর মধ্যে এমন এক শান্ত গম্ভীর লাবণ্য আছে যে আপনার মন কেমন পবিত্র আর করুণ হয়ে উঠবে। ছানুর মাথায় কোঁকড়ানো ঘন বেঁটে চুল। টানা টানা রোদ রোদ ছায়া ছায়া চোখ, সুন্দর নিটোল চিবুক, লম্বা গলা, হাঁসের গলার মতো মনে হয়। ওর যৌবন শান্ত অনুগ্র, নির্জন ঝর্ণার মতো, দুটি নিটোল সুন্দর হাতে দু'গাছি সোনার বালা।

আমি এক পলক ছানুকে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। উপরের বারান্দায় ডাইনিং টেবিল আর গুটি কয়েক চেয়ার। ছানুর দুই বোন সেখানে বসে ছিল। একজনকে আমি আগেই দেখেছি, তার চেয়েও ছোটো বছর তের বয়সের ফ্রক-পরা আর একটি মেয়েও ছিল।

ছানু সামনের ঘরে আমাকে নিয়ে ঢুকল। দেখলাম, সে ঘরে দু'দিকে দুটি নিচু খাট। মাঝখানে ছোটো নিচু টেবিলে ওষুধের শিশি, ফল, ফিডিং কাপ এইসব রোগীর নানান জিনিস। একটি খাটে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন, সম্ভ্রান্ত শীর্ণ চেহারা।

ছানু বলল, বাবা, ইনি মৃন্ময়বাবু।

আমাকে বলল, বাবা।

আমি পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

উনি বললেন, সুখী হও, তোমাদের বাড়ির সব ভালো তো? তোমার মা

ভালো আছেন তো? তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। তোমরা জানো না।

ও-পাশের খাটে একজন রুগ্ন মহিলা শুয়েছিলেন। চোখের নীচে কালি, কঙ্কালসার মূর্তি।

ছানু আমাকে বলল, মা।

আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। উনি বেশ কষ্টেই উঠে বসলেন, বললেন, থাক বাবা থাক, দীর্ঘজীবী হও।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি চিররুগ্ন বাবা, ছানু আছে তাই বেঁচে আছি, ও আমাকে কিছুতেই মরতে দেবে না।

চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, যাও, কিছু খেয়ে নাও গে।

ছানুর সঙ্গেই ঘর থেকে বারান্দায় এলাম।

ছানু বলল, আমার দুই বোন, শান্তিলতা আর প্রীতিলতা।

দুই বোন উঠে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, শান্তিলতা, প্রীতিলতা আর কী লতা?

ছানু, সামান্য হাসল, ওর সুন্দর সাজানো দাঁত আমার চোখে পড়ল।

ও বলল, আর ছায়ালতা, তার থেকে ছানু।

আমি বললাম, বাঃ।

ও বলল, আপনি বসুন, আমি দাদাকে ডেকে আনি।

বলে নীচে চলে গেল।

আমি শান্তি আর প্রীতির সঙ্গে ভদ্রতা করতেই কথা বললাম, এই বাড়ি কি কোম্পানীর কোয়ার্টার্স?

শান্তি বলল, না, না, ভাড়া বাড়ি। কোয়ার্টারে মাত্র দুটো ঘর দেয়, তাতে আমাদের হবে না বলে দাদা এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে।

—তোমরা কোন স্কুলে পড়?

—স্কুল আছে, আধ মাইল দূরে।

—তোমাদের দিদি?

—দিদি আর পড়ে না, নাইন ক্লাস পর্যন্ত পড়ে মায়ের অসুখের জন্যে আর পড়তে পারে নি।

অবিনাশদা আর ছানু এলেন।

অবিনাশদা বললেন, খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মৃন্ময়, সকলের সঙ্গে পরিচয় হল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কেমন লাগছে বলো?

—খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর।

—কটা দিন ভালো করে বিশ্রাম করে নাও, বেড়াও-টেড়াও, তারপর অন্য চিন্তা।

সেদিন লুচি মিষ্টি দিয়ে জলযোগ সেরে চা খেয়ে নীচে আমার ঘরে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

একটুখানি চুপ করে থেকে মৃন্ময়বাবু আবার বলতে লাগলেন, আমি স্বর্গে কখনো যাব না, স্বর্গ কি জানি না, কিন্তু সেই কটা মাস ছানুদের বাড়িতে আমি স্বর্গবাসই করেছিলাম। আমি যেন এক অলৌকিক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। অমৃত শুধু দেবতারাই খান কিন্তু মানুষও বোধহয় কখনো কখনো অমৃতের স্বাদ পায়, আর অমৃতের নেশা মদের নেশার চেয়েও নিশ্চয় লক্ষগুণে জোরালো। সেই অমৃতের নেশাতেই বোধহয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত যে ইঙ্গিতময় ঘটনা. বিচিত্র অনুভূতি, অপূর্ব সব অভিজ্ঞতা! তা বর্ণনা করবার মতো শক্তি ভগবান আমাকে দেন নি, কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হলে মানুষ সে উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারবে কেমন করে? আর কবিত্ব তো ঈশ্বরেরই দান। আমি কবি নই। তবু দু একটা মোটা ব্যাপার আপনাকে বলতে পারব।

ওখানে যাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই ছানুর সঙ্গে আমি কেমন যেন একাত্মতা অনুভব করতে লাগলাম। আমার মনে হত, ও যেন ওর রূপ নিয়ে, ব্যক্তিত্ব নিয়ে, ওর সুন্দর আবির্ভাব নিয়ে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই ওকে আমার বড় আপন বলে মনে হল।

আমি অবিনাশদার কোম্পানীতে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। এবং কাজ পেয়ে যেন বাঁচলাম। তারপর আমার অস্তিত্ব জুড়ে, আমার রক্তের গভীরে, আমার নিঃশ্বাসে, প্রাণ-স্পন্দনে যেন অকস্মাৎ এক অদ্ভুত আনন্দ ও বেদনার গভীর প্রেরণার অবিরাম লীলা শুরু হয়ে গেল। বীটোফেনের মতোই কোনো মহাশিল্পী যেন আমার গভীরে আকাশের নীলিমার মতো সমুদ্রের কল্লোলের

মতো, হিমালয়ের গম্ভীর শ্যামরূপের মতো বিশাল বেদনা ও আনন্দের ব্যাকুল সুর অবিরাম বাজিয়ে চললেন। আমি মনে মনে জপ করতাম, আমার ছান্নু, ছান্নু আমার !! ছান্নু এই অর্থহীন অদ্ভুত নামটাও আমার কাছে সুন্দরতম ব্যাপার হয়ে উঠল।

আমার বিছানা সব সময়েই পরিপাটি থাকত। আনলায় সব সময়েই ধোয়া জামা-কাপড় থাকত। আমার গেঞ্জি রুমাল কখনো ময়লা হত না। আমার ঘরের কুঁজোতে সব সময়েই ঠাণ্ডা জল ভরা থাকত।

একদিন অফিস থেকে ঘরে ফিরে দেখলাম, আমার মামুলি বিছানার চাদর আর নেই, ধবধবে হাঁসের পালকের মতো শুভ্র চাদর বিছোনো আছে, নিটোল বালিশে ঝালর-দেওয়া কাচা নতুন ওয়াড়ের এক কোণে সবুজ সিল্কের সুতোর ছোট্ট একটি লতা, মধ্যে ইংরেজি অক্ষর 'এম'। মাথার কাছে ছোটো টেবিলের উপর সুন্দর ফুলদানিতে রজনীগন্ধা আর গোলাপের ঝাড়।

আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে ধোয়া ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ফ্যান খুলে সেই ধবধবে বিছানায় বসে খোলা জানলা দিয়ে বাগান, মাঠ আর গাছপালার দিকে তাকিয়েছিলাম। বিছানায় আমি যেন অনেকটা সন্তর্পণে বসে রইলাম, শয্যার সেই শুভ্রতা এবং পবিত্রতা যেন কোনো রকমেই ক্ষুণ্ণ না হয়, নিটোল সুন্দর সেই বালিশে একবার গন্ধ শুঁকলাম, সেন্টের খুব মৃদু মধুর সুগন্ধ আমার অনুভূতির গভীরে যেন যুঁই ফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে গেল। আমার জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল, বালিশের ওপাশে দেখলাম একখানি সুন্দর বই, ভালোবেসে হাতে নিয়ে দেখলাম, জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। তার আগে আমি জীবনানন্দের কবিতা পড়ি নি। প্রথম কবিতা 'বনলতা সেন' পড়েই ছান্নুর উপরে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আকর্ষণ যেন দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলল।

আমি অভাবিত আরও কিছুর প্রতীক্ষায় দুরু দুরু বুকে চুপ করে বসে-ছিলাম। এমন সময় নতুন শাড়ির মৃদু খস্ খস্ শব্দ পত্র-মর্মরের মতো আমার কানে এসে পৌঁছল। ছান্নু এসে ঢুকল আমার ঘরে। বাঁ হাতে ঝক-ঝকে মস্ত বড় কাঁসার রেকাবিতে কিছু সুখাদ্য, ডান হাতে জলের গেলাস। আমার ঘরের বেতের টেবিলে রেকাবি আর গেলাস নামিয়ে টেবিল আমার কাছে টেনে নিয়ে এল। আমি ছান্নুকে দেখছিলাম। আসার পর থেকে ছান্নুকে আমি এমন করে সাজতে কোনোদিন দেখি নি। সাধারণ রঙিন

তাঁতের শাড়ি, ছিটের ব্লাউজ আর আঁট করে বাঁধা বিশাল খোঁপাতেই ছানু সুন্দর। আজ দেখি, মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি পড়েছে ছানু, মেঘরৌদ্র চোখে আজ কাজল এঁকেছে, ঠোঁটে বুঝি হালকা করে লিপস্টিক বুলিয়েছে, ছানুকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

ছানু বলল, নিন, খিদে পেয়েছে খেয়ে নিন, আমি চা নিয়ে আসি।

আমি শুধোলাম, কি ব্যাপার ছায়ালতা।

ছায়ালতা রহস্যের হাসি হেসে বলল, ব্যাপার আছে, বলব, আপনি ততক্ষণ খেয়ে নিন, আমি চা নিয়ে আসি, চা খেতে খেতে বলব।

ছানু স্নিগ্ধ সৌরভে আমাকে বিস্মিত ব্যাকুল করে ঘর থেকে চলে গেল। আমার খিদে পেয়েছিল, আমি সেই সব সুখাদ্য নিয়ে পড়লাম।

খাওয়া প্রায় শেষ হলে ছানু এল ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। দুটি কাপে চা ঢেলে আমাকে দিয়ে নিজেও একটা কাপ নিয়ে বেতের চেয়ারে বসল।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে আবার শুধোলাম, আজ কী ছানু?

তেমনি নিগূঢ় হাসি হেসে ছানু বলল, কি বলুন তো?

—সত্যি জানি না, কেমন করে জানব?

ও আমার দিকে ওর দৃষ্টির সেই সুধাবর্ষণ করে বলল, আজ আপনার জন্মদিন।

—আমার জন্মদিন?

—হ্যাঁ গো মশাই।

—আমার জন্মদিন তুমি জানলে কেমন করে?

—আমাকে একদিন আপনি বলেছেন।

—আমার জন্মদিনে এত আয়োজন! আমি কে যে তাই এত কাণ্ড!

ছানুর চোখ একটু বুঝি করুণ হয়ে উঠল, বলল, বিদেশে বিভুঁয়ে মায়ের কাছ থেকে এত দূরে পড়ে আছেন, আমরাই তো আপনার জন্মদিনে একটু আদর-যত্ন করব।

একটু থেমে বলল, আপনার এখানে খুব অযত্ন হয়? না?

—অযত্ন! আমাকে তো তোমরা রাজার হালে রেখেছ।

সত্যিই তখন নিজেকে আমার রাজা বলেই মনে হচ্ছিল। আমি জানতাম, বিখ্যাত মানুষদেরই জন্মদিন পালন করা হয়। আমার মতো তুচ্ছ সামান্য জীবের আবার জন্মদিন! জানেন, আমি জন্মান্তর বিশ্বাস করি, আমার

মনে হতে লাগল, আমার অনেক জন্মের পুণ্যের ফলেই আজ আমি এত ভালোবাসা পেলাম, পৃথিবীতে কটা লোক ছান্নুর মতো মেয়ের এই দুর্লভ ভালোবাসা পায়। অনেক জন্মের পুণ্য থাকলে তবে আমাদের হৃদয়ের ঝিনুক একটি ভালোবাসার মুক্তো লাভ করে, যেমন নাকি অনেক জন্মের সাধনার ফলে আমাদের কারও কারও অনুভূতির ঝিনুক কবিত্বের দুর্লভ মুক্তাকে ধারণ করে। আমার তখন ভীষণ ভয় হতে লাগল, মনে হল, এই আশ্চর্য সময় তো মুহূর্তেই হারিয়ে যাবে, এ যেন আকাশের ক্ষণস্থায়ী কোনো রঙের মতো, এ উপলব্ধি দিব্য কোনো প্রেরণার মতো।

আমরা দুজনে চুপ করে বসেছিলাম। বাইরে আস্তে আস্তে সন্ধে ঘনিয়ে আসছিল, ঝিঁঝির অস্পষ্ট ঝঙ্কার কানে বাজছিল, একটি ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যা আনন্দের গুরুভারে আমার কাছে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল।

এমনি সময় পাশের বাড়ির বৌদি এসে ঘরে ঢুকলেন, কলসীতে জল ভরার মতো অদ্ভুত হেসে বললেন, কি রে ছান্নু, তোরা দুজনে অমন করে বসে আছিস? অন্ধকার হয়ে এল, আলো জ্বেলে দে।

ছান্নু সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, বৌদি, তুমি আসতে বড় দেরি করলে, বসো আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

বৌদি বললেন, না রে আমি চা খেয়েই এলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।

বৌদি পূর্ণ যুবতী। আর আমার মনে হয়েছিল, এ মেয়ের যৌবন কখনো ফুরোবে না; এরা বুঝি যৌবনেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, এদের বার্ধক্য যেন কল্পনাই করা যায় না। বৌদি সব সময়েই হাস্যেলাস্যে কৌতুকে ঝলমল করতেন।

বৌদি ছিলেন ছান্নুর অসমবয়সী সখী। দুই বাড়িতে দিন-রাত আসা-যাওয়া ছিল। আমিও কতদিন বৌদির বাড়িতে গেছি। দাদাও ছিলেন প্রাণবন্ত আনন্দময় পুরুষ। দাদা অফিস থেকে ফিরে ক্লাবে যেতেন তাস খেলতে। আর বৌদি প্রায়ই আসতেন ছান্নুর সঙ্গে আড্ডা দিতে। বৌদির ছোটো সংসার, একটি মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু ছান্নুর ঘাড়ে বিরাট সংসার, রুগ্ন মা-বাবা। ছান্নুর অনেক কাজ ছিল, দায়িত্ব ছিল, তবু বৌদি ছান্নুর শত কাজ ও দায়িত্বের মধ্যে হাসি ও আনন্দের ফুল ছড়িয়ে যেতেন। সন্ধেবেলায় অবিনাশদাও বাড়িতে থাকতেন না, তাঁর কোন এক বন্ধুর কাছে যেতেন।

অতএব বৌদি আর ছানু আর আমার মধ্যে এক বিচিত্র বন্ধুত্ব দিনের পর দিন গড়ে উঠেছিল।

বৌদি বললেন, আমি বাপু আলো জেলে দিচ্ছি, তোমাদের ধ্যান ভেঙে যাবে হয়তো, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকতে পারব না, আমার বাবা আলো চাই।

বৌদির হাতের ছোঁয়ায় নিয়ন জলে উঠল, নরম উজ্জ্বল আলোয় ঘর আমার হেসে উঠল।

বৌদি আমার বিছানার একধারে বসে বললেন, ছানু অনেকদিন তুই গান গাস না, কতদিন তোর গান শুনি নি রে, আজ একটা গান শোনা তুই।

ছানু বৌদির মুখের দিকে হাসিমুখে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে আমার চোখে একবার চোখ ফেলে মাথা নিচু করল, তারপর নিচু গলায় গান ধরল।

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ-কুসুম চয়নে
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দু'খানি নয়নে
নয়নে নয়নে।'

ছানু যে খুব ভালো গান করে তা নয়, কিন্তু সুরটি ওর শুদ্ধ থাকেই আর ওর আশ্চর্য গলা আর সেদিনের তীব্র আকুতি ওর গানকে সে যে কি ব্যাকুলতায় ভরে তুলেছিল, আজও মনে হলে আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

জানেন, আর একদিনের কথা আমার বড় মনে পড়ে। আজ কুড়ি বছর আগের কথা, তবু মনে হয়, যেন সেদিনের ঘটনা।

একদিন চৈত্র মাসের পূর্ণিমা রাতে আমি বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে উঠে বসলাম। ঘড়ি দেখলাম, রাত্রি একটা বাজে। চারদিক নিঃস্তব্ধ নিঝুম। নির্জনতার, শূন্য মাঠ ও বনের এমন এক কুহকময় শব্দ আছে, এমন এক ভয়ঙ্কর মাদক আকর্ষণ আছে যে ভাবা যায় না। আমি আর যেন ঘরে টিকতে পারলাম না। বাইরের দিকের দরজা খুলে বাগানে নেমে গেলাম। মাথা নিচু করে বাগানের পথে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম, হঠাৎ অলঙ্কারের রোমাঞ্চকর শব্দ শুনে মুখ তুলে দোতলার দিকে তাকালাম। দেখলাম ছানু উপরের বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে আছে। একবার চারদিকে চোখ মেলে তাকালাম।

দিগন্ত পর্যন্ত ধু ধু করছে ঢেউ-খেলানো পাথুরে মাটি, মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গল, নিঃসঙ্গ অথবা যূথবদ্ধ গাছের দল, সমস্ত পৃথিবী যেন চাঁদের আলোয় নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ সমাহিত হয়ে পড়ে আছে, মাঝআকাশে সর্বদ্রষ্টা চাঁদ নিঃশব্দ, উদাসীন। আমি ছানুর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার বুকের ভিতরে সমুদ্র যেন জোয়ারে উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। ছানু রেলিংয়ে হাত রেখে নীচের দিকে একটু ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর দেবীপ্রতিমার মতো মূর্তি চাঁদের আলোয় সিক্ত হয়েছিল। আমার কাছে পৃথিবীর সুন্দরতম অপরূপ বিস্ময় বলে মনে হচ্ছিল ওকে। সেদিন কতক্ষণ যে অমনি করে দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। এক সময় ছানু হাত নেড়ে বিদায় জানাল, ও ভিতরে গেলে, আমি ঘরে এসে ক্লান্ত বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম।

মৃন্ময়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, আকাশে এক টুকরো চাঁদ ছিল, আবছা আলোয় আমরা বসে ছিলাম। সন্ধ্যার বাতাসে চাঁদের আলোয় ভেজা কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখা দুলছিল।

মৃন্ময়বাবু আবার বললেন, আর একটা ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গ আমি শেষ করব, কে আর পুরোনো কথা ঘেঁটে অকারণে কষ্ট পেতে চায় বলুন।

বৌদি ওঁদের বিবাহ-বার্ষিকীতে বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করতেন। সন্ধে-বেলায় দাদার বন্ধুরা সস্ত্রীক আসতেন। খাওয়া-দাওয়া হত। সেবার আমাকে আর ছানুকে উনি দুপুরবেলা নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে সেদিন আমাকে অফিস কামাই করতে হল। আমি বেলা বারোটা নাগাদ একাই বৌদির বাড়ি গিয়ে দেখলাম. ছানু আগেই এসেছে। আর সন্ধের সময় খাওয়া-দাওয়া হবে বলে দাদা কিন্তু অফিসে গেছেন।

ছানু সেদিনও সেজেছিল। পরনে চমৎকার খয়েরী রঙের ফুলটুল আঁকা একখানি দামী তাঁতের শাড়ি, ম্যাচ-করা ব্লাউজ। ঘন গোছ-ওয়ালা কোঁকড়ানো চুলে বোধহয় সাবান দিয়েছিল, চামরের মতো সেই চুল কেশরের মতো ওর সুন্দর মুখটিকে বেষ্টন করে আলুলায়িত হয়েছিল। বোধহয় সেদিন ও ওর টানা টানা সুদীর্ঘ দুটি ভুরুও কালি দিয়ে এঁকেছিল, চোখে ছিল কাজল। ওর ঠোঁট ও চিবুকের চারপাশের আবছা রোঁয়াও সেদিন আমার কাছে অদ্ভুত সুন্দর লেগেছিল। ওর ভরাট গোড়ালি আর নিখুঁত নিটোল ধবধবে পা সেদিন আমি প্রাণভরে দেখেছিলাম।

আমি, বৌদি আর ছানু তিনজনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে নানান গল্পগাছা করে খাওয়া শেষ করলাম। তারপর আমি হাত ধুয়ে এলে বৌদি বললেন, আপনি আমার ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিন। আমি আজ আপনাকে চমৎকার পান খাওয়াব, যান নিয়ে যাচ্ছি।

—আমি তো পান খাই না।

—ধ্যাৎ অবাধ্য ছেলে, আজ খাবে, নেমন্তন্ন খেলে, পান খেতে হবে না!

অগত্যা বাধ্য ছেলের মতো বৌদিদের শোবার ঘরে গিয়ে খাটের সুন্দর বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটু বুঝি চোখ বুজেও এসেছিল, হঠাৎ দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া, চুড়ি-কাঁকনের বিদ্রোহী রিনিঠিনি শুনে তাকিয়ে দেখি, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেই বন্ধ দরজা খুলবার জন্যে ছানু কড়া ধরে টানাটানি করছে।

বাইরে থেকে বৌদির দুষ্টু গলা শুনতে পেলাম, ভাব-সাব বোঝাপড়া না হলে আজকে আর দরজা খুলছি না।

—ছানু বলল, এই বৌদি, লক্ষ্মী বৌদি, কি ছেলেমানুষী করছেন!

—আমি এখন আমার মেয়ে নিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছি, তোমরা ততক্ষণ একটু বুড়োমানুষী করো।

বৌদি সত্যিই অন্য ঘরে চলে গেলেন।

ছানু দরজায় পিঠ দিয়ে লজ্জায় রাঙা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর হাতে পানের খিলি।

আমি খানিকক্ষণ ছানুর দিকে ঈষৎ ভীত ও কম্পিত বুকে হৃদয়ের দুরন্ত কল্লোল নিয়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, পান কি আমার?

ও এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। আস্তে করে খাটের কাছে এসে পানটা আমার হাতে দিল। তারপর সরে গিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে বলল, ছি ছি, বৌদিটা কি! এমনি করে পান দেওয়ার কি মানে জানো!

হঠাৎ গল্প থামিয়ে মৃন্ময়বাবু বললেন, জানেন তো আমাদের দেশের একটা পুরোনো রীতি হচ্ছে, কুমারী মেয়েদের অনাত্মীয় পুরুষকে পান দিতে নেই। পানটা অনেকটা প্রতীকের মতো। তখন আমি ঠিক জানতাম না, তবু আন্দাজ করলাম।

—আমি বললাম, বৌদি সত্যি ছেলেমানুষ একেবারে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, ছায়ালতা, বৌদির কাছে আমি কিন্তু চিরকৃতজ্ঞ থাকব, আমার বড় কষ্ট ছায়ালতা।

ছানু বলল, আর আমার?

—তোমারও কষ্ট।

—তুমি বোঝ না?

এই 'তুমি' শব্দ যে কি রকম স্পর্শমণির মতো কিম্বা ইলেকট্রিক শকের মতো কাজ করে, ঠিক জায়গায় ঠিক মেয়ের মুখ থেকে কখনও যে শোনে নি সে কল্পনাও করতে পারবে না মশাই! আপনি থেকে তুমিতে আসা, এ যেন নদী বয়ে যেতে যেতে হঠাৎ প্রপাত হয়ে ঝরে পড়ার মতো। বাংলাভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষায় এই রহস্যের যাদু যে আছে তা জানি না। আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠলাম। আমার চারদিকে যেন ঝড় উঠল, হা হা করে যেন উন্মাদ আনন্দের হাততালি দিয়ে দিয়ে সেই ঝড় অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে নেচে বেড়াতে লাগল। আমি তখন কী করছি কী ভাবছি সে বোধও হারিয়ে ফেললাম। খাট থেকে নেমে টলতে টলতে ছানুর কাছে গিয়ে আমি ছানুর বিস্মিত মুগ্ধ মুখখানি দু' হাতের তালুতে ধরে ওর দেবীদুর্লভ দু'খানি আধ চাঁদের মতো ঠোঁটে চুমু দিয়ে বসলাম। আমার ঠোঁটে অমৃতের স্বাদ যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠল, আমার এই সামান্য মানবশরীরে আমি বিশ্বশক্তির কোনো আবিভাব যেন সহসা উপলব্ধি করলাম। আমি বিছানায় মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে কতক্ষণ সেই ভয়ঙ্কর অনুভূতির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

তারপর উঠে দাঁড়ালাম, শুধোলাম, ছায়ালতা, তুমি আমার?

ছানুর চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ল, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুমি কি তা জানো না।

চোখে ও আঁচল তুলে নিল। আমি ছানুকে দু' হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলাম, ওর গালে মুখ রেখে কতবার বললাম, কেঁদো না, কেঁদো না, ছায়ালতা, ছানু, তুমি আমার, আমার!!

দরজা খোলার শব্দ হল। ছানুকে ছেড়ে দিলাম আমি, ছানু দরজা টেনে খুলে বেরিয়ে গেল। আমি আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে গেলাম।

বৌদি বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, ঠাকুরপো, ছানুকে এত কষ্ট কেন দিচ্ছেন?

আমি থমকে দাঁড়ালাম, বললাম, বৌদি, কষ্ট তো আমারও। আপনি ছানুর বাবাকে দাদাকে বলুন।

—বলব?

—বলুন আপনি।

বৌদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরদিন সন্ধেবেলায় শান্তি এসে আমাকে বলল, মৃন্ময়দা, মা আপনাকে একবার দেখতে চাইছেন, যাবেন একবার?

—চলো।

আমি শান্তির সঙ্গে উপরে গেলাম। অবিনাশদা যথারীতি তখন বাড়িতে ছিলেন না। ছানুর মার ঘরে ঢুকে দেখলাম, ছানুর বাবা নেই। বোধহয় তিনি প্রতিদিনের মতো ছাদে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। ছানুর মা একাই সে ঘরে বিছানার সঙ্গে যেন মিশে ছিলেন। আমি ঢুকতে তিনি আমাকে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসো বাবা, বসো।

শান্তিকে হাতের ইঙ্গিতে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। তারপর সেই রুগ্ন মানুষটি জ্বলজ্বলে চোখে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন, দুটি শীর্ণ উত্তপ্ত হাতে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা মৃন্ময়, ছানুকে তুমি নাও, ও বড় ভালো মেয়ে, ওর তুলনা নেই বাবা, অন্য কোনো মেয়ে হলে এমন করে চব্বিশ প্রহর বুড়ো মা-বাবাকে সেবা করতে পারত না, তুমি সুখী হবে বাবা!

আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছিল, জানেন। বড্ড যেন নাটক নাটক মনে হচ্ছিল। মাথা নিচু করে রইলাম, কথা বলতে পারলাম না।

তিনি আবার বললেন, তাহলে আমি নির্ভাবনায় মরতে পারব বাবা!

আমি আমতা আমতা করে বললাম, অমন করে বলবেন না, আমি তো, আমি তো বলেছি।

তিনি বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লেন।

—তুমি সুখী হবে বাবা, যাও, তোমার ঘরে যাও।

আমি তাঁকে প্রণাম করে যেন কোনো ভারি বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে আমার ঘরে এসে বসলাম। সামান্য পরে শান্তি আমার ঘরের

দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে চাপা গলায় মিষ্টি করে হেসে বলল, জামাইবাবু!

ঠিক সাতদিন পরে সকালবেলায় শুনলাম, ছানুর মার অবস্থা খুব খারাপ। সারারাত অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। সকাল থেকেই বারংবার ডাক্তার এলেন। বাড়িতে গম্ভীর দম-আটকানো পরিবেশ ঘনিয়ে উঠল। আমি, অবিনাশদা অফিসে গেলাম না। সারাদিন কঠিন উদ্বেগের মধ্যে কাটল। কিন্তু বিপদ কাটল না। সন্ধেরাতে ছানুর মা মারা গেলেন। আমি দেখলাম, ছানুর আয়ত্ত চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে। মেয়েরা কাঁদছে, অবিনাশদা কেবলই চোখ মুছছেন। ছানুর মার মৃতদেহ বার করবার জন্যে ওঁদের ঘরে গেলাম আমরা, দেখলাম ছানুর বাবাও কাঁদছেন। বৃদ্ধের সেই কান্না কি ভীষণ, কি দুঃসহ, কি ভয়াবহ!

আমি এতদিন জানতাম না ছানুর মা-বাবা কি রোগে ভুগছেন। সেদিন মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর রক্তাক্ত বালিশ, রক্তের দাগ-লাগা কষ দেখে জানলাম, তিনি টিবি-তে ভুগছিলেন। এ বাড়িতে এসে আমি দুদিন মাত্র ওঁদের ঘরে ঢুকেছি। আর ওদের রোগ নিয়েও বাড়ির কেউ আলোচনা করত না। হয়তো বা সকলে গোপনই করতে চাইত। কিন্তু যখন জানলাম, এ বাড়ির বাতাসে, এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে টিবি-র মৃত্যু-জীবাণু ছড়িয়ে আছে, সঙ্গেসঙ্গে বীভৎস ভয়ে আমার ভিতরটা কাঁপতে লাগল।

অবিনাশদার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক জুটিয়ে ছানুর মাকে তাঁর বিছানা, কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্র, ব্যবহার্য জিনিস-পত্র সমেত খাটুলিতে বেঁধে রাত্রি দশটার সময় কাঁধে নিয়ে শ্মশানে গেলাম। শ্মশান অনেক দূর। এক শীর্ণস্রোতা নদীর ধারে পাথুরে প্রান্তরের মধ্যে কিছু গাছপালার আড়ালে সেই শ্মশান। আকাশে চাঁদ ছিল, প্রবল দক্ষিণে হাওয়া! চিতার লকলকে আগুন জ্বলে উঠল। নদীর ধারে এক জায়গায় নির্জনে বসে বসে আমি মানুষের ছাই হয়ে যাওয়া দেখলাম।

প্রায় ভোরবেলায় বাড়ি ফিরলাম আমরা। কিন্তু আমি যেন আর স্বস্তি পেলাম না। ওখানে থেকে আমার ভয় করতে লাগল, ও বাড়ির বাতাসে নিঃশ্বাসও যেন আমি সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। মনে হত, খাবারের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, জলের সঙ্গে টিবি-র মৃত্যুবাহী জার্ম আমার ফুসফুসে গিয়ে ঢুকছে, আমিও আক্রান্ত হব, আমিও মরব। অশান্তিতে, মৃত্যুভয়ে

এখান থেকে ছুটে পালাবার দমিত ইচ্ছায় আমার সব সুখ, সব স্বস্তি বিষিয়ে উঠল। যতক্ষণ সম্ভব আমি বাইরে বাইরে কাটাতে লাগলাম। এমন কি ছানুকে দেখলেও আমার ভয় হত, মনে হত, ও ওর ফুসফুসে নিশ্চয়ই টিবি-র জীবাণু বয়ে বেড়াচ্ছে। ওরও নিশ্চয় টিবি হয়েছে।

এমনি যখন সন্ত্রস্ত, দিশেহারা, মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত আমি পালাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, তখন আমাদের পরিবারের প্রধান জেঠামশাইয়ের চিঠি পেলাম।

কল্যাণীয়েষু,

অবিনাশের বাবা তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু আমাদের এ বিয়েতে মত নেই। ও বাড়িতে টিবি ঢুকেছে। ও ভীষণ রোগ. ও রোগ মানেই মৃত্যু, সর্বনাশ। ও রোগ বংশে ঢুকলে সে বংশের আর নিষ্কৃতি নেই। ওর নাম রাজরোগ। অতএব তুমি যত শীঘ্র পার ওদের সংস্পর্শ ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। তোমার জন্যে আমাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার শেষ নেই। আশীর্বাদ জানবে।

ইতি

আশীর্বাদক

আমার মনের মধ্যে তখন এক ভীষণ দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণা শুরু হল। ছানুকে আমি ফেলতে পারছি না আবার ছানুকে আমার মৃত্যুদূত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার সেই নতুন যৌবনে মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি করার সাহসও হচ্ছিল না আমার। কেননা ছানুর মায়ের সেই বীভৎস, মৃত্যু-কবলিত রুগ্ন চেহারা আমি দেখেছিলাম।

অবিনাশদা আমার চাঞ্চল্য, আমার দ্বিধা, আমার ভয় বোধহয় দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিলেন, আমি যাতে কোম্পানীতে কোনো ভালো পোস্টে বসতে পারি। আমি নিজেও খুব মন দিয়ে কাজ করতাম। যে কারণেই হোক, আমাদের কোম্পানীতে হঠাৎ একজন বৃদ্ধ কর্মচারী রিটায়ার করাতে সাময়িকভাবে সেই জায়গায় আমাকে বসানো হল। সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টার্সও পেয়ে গেলাম। আর অবিনাশদা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বললেন, মৃন্ময়, তোমার নতুন কোয়ার্টার্সে গিয়েই থাকা ভালো, না হলে হয়তো ও কোয়ার্টার্স অন্য কাউকে এলট করা হবে।

অতএব এক রবিবার সকালবেলায় সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেডিংপত্র

বেঁধে চলে যাবার জন্যে তৈরী হলাম। ছানুর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বসন্তের উজ্জ্বল দিনে যেন অকাল বর্ষা নেমেছে। ছুটন্ত ট্রেন থেকে অনেক সময় নির্জন মাঠে এমন পুরোনো নিঃসঙ্গ বাড়ি চোখে পড়ে, যাকে সুপুরি বা অন্য কিছু গাছ ঘিরে রেখেছে, কাছাকাছি কোনো মানুষ নেই, লোকালয় নেই। ছানুকে আমার তেমনি নিঃসঙ্গ, রিক্ত, পরিত্যক্ত বলে মনে হল। তবু আমাকে চলে যেতে হল।

হঠাৎ মৃন্ময়বাবু চুপ করে গেলেন। তারপর আচমকা বলে উঠলেন, নতুন কোয়ার্টার্সে উঠে যাবার পর আমার পুরোনো বিছানাপত্র সব ফেলে দিয়েছিলাম, জানেন!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একদিন বেলা বারোটা একটার সময় মাথায় হ্যাট লাগিয়ে অবিনাশদার বাড়ির পাশ দিয়ে ফিরছিলাম। অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা ছিল না বলেই ও পথ দিয়ে আমাকে আসতে হচ্ছিল। আমার কাজটা ছিল অনেকটা বাইরে বাইরে। কোম্পানীর ভিকল্ ম্যানেজারের কাজ। বাইরে এক জায়গায় কিছু লরি অকেজো হয়ে পড়েছিল, তাই দেখাশুনো করতে গিয়েছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, দারুণ গরমে আমি কল কল করে ঘামছিলাম, আর চোখ মুখ জ্বালা করছিল। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে জায়গাটা দ্রুত পার হবার চেষ্টা করছিলাম। কেননা ছানুর সামনে দাঁড়াবার মতো নৈতিক সাহস আমার ছিল না আর টিবি-ওয়ালা ঐ বাড়িতে ঢুকতে আমার বড় ভয় ছিল।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, জামাইবাবু! জামাইবাবু!!

মুখ ফিরিয়ে দেখি, শান্তি ছুটতে ছুটতে আসছে। আমাকে দাঁড়াতে হল। শান্তি আমার কাছে এসে হাত চেপে ধরল, বলল, বাড়িতে না এসেই চলে যাচ্ছেন যে!

আমি বললাম, মানে কোয়ার্টারে ফিরে চানটান করব, মানে।

—চান করেন নি, খান নি?

—মানে চান করে খেয়ে বেরিয়েছি, তবে এখন একবার গিয়ে গা না ধুলে...।

—আমার সঙ্গে আসুন, দিদি ওপর থেকে আপনাকে দেখে ডেকে আনতে বলল।

আমাকে যেতে হল। সেই পরিচিত বাগান পেরিয়ে আমার সেই ঘরে

গিয়ে বসলাম। শান্তি পাখা খুলে দিল।

মিনিট পনের পর কাঁচের গেলাসে এক গ্লাস লেবুর সরবত নিয়ে ছানু এসে ঘরে ঢুকল। আমার সামনের টেবিলে সরবতের গ্লাস নামিয়ে রেখে বলল, সরবতটুকু খেয়ে নাও। এত রোদ্দুরে বেরিয়েছ কেন, লু বইছে যে।

আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বললাম, বাইরে একটা জরুরী কাজ ছিল, না গিয়ে উপায় ছিল না।

আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সরবত খেতে আমার রুচি হচ্ছিল না। যক্ষ্মা রোগের ভয়ঙ্কর ভয় আমার বুকের মধ্যে চেপে বসেছিল। ছানুর দিকে একবার তাকাতেই ওর দীপ্র চোখে আমার চোখ পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলাম। ছানুর মূর্তি আমার মনে নতুন করে জেগে রইল। ছানুকে বড় ক্লান্ত মনে হল আমার। ওর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে একটি আনন্দময় গাম্ভীর্য ছিল, এখন মনে হল, আনন্দটুকু উবে গেছে কিন্তু গাম্ভীর্যটুকু বিষণ্ণতায় মেঘলা হয়ে আছে।

ও আবার বলল, সরবতটুকু খেয়ে নাও, ভালো লাগবে!

আমি বললাম, না মানে এখন ঠিক সরবত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, মানে ইয়ে, আমি সরবত এখন আর খাব না।

বলে অনুনয়ের দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকালাম। মনে হল বাইরের রোদ্দুরের জ্বালা আর তেজ যেন ওর চোখে ঝকঝক করছে। মনে হল, ও যেন বলছে, তুমি এত ভীতু, এত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, ভালোবেসে দিলাম তুমি খাবে না!

আমি স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

ছানু হঠাৎ বলল, সরবতটা আমাদের বাড়ির নয়, পাশের বাড়ির বৌদির কাছ থেকে করিয়ে এনেছি। তোমার প্রাণের দাম তো আমার কাছেও আছে।

জানেন, এখনও সে কথা মনে হলে আমার সমস্ত ভেতরটা ছি ছি করে ওঠে। ছানুর কণ্ঠস্বরে, ছানুর ঐ দুটি কথায় কত বড় দুঃখ, বেদনা, হাহাকার আর আত্মবিলাপ যে ছিল আজও তা যেন শুনতে পাই। ওই কথা কটি এখনও আমার পাঁজরের ভিতরে যেন গম্ গম্ করে প্রতিধ্বনিত হয়।

আমি আর মিথ্যা অজুহাত দিয়ে কোনো সাফাই গাইবার চেষ্টা করলাম না, ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে সরবতটা খেয়ে নিয়ে মুখ মুছলাম।

ছানু বলল, বাবারও বোধহয় টিবি হয়েছে, দাদা কলকাতা নিয়ে গেছে ভালো ডাক্তার দেখাতে।

আমি কথা বললাম না।

ছানু বলল, এসো এবার, তোমার আবার অফিস যেতে দেরি হয়ে যাবে।

আমি আর একটু বসে উঠে দাঁড়ালাম, কোনো কথা বলতে পারলাম না, একবার ওর ম্লান চোখের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বাগান পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ছানু বারান্দায় প্রতিমার মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওর স্থির চোখে এই রোদ-পোড়া ধু ধু প্রান্তরের মতো শূন্যতা। আমি লজ্জা, ঘেন্না, ভীরুতার বোঝা বয়ে হেঁটে যেতে লাগলাম।

আমার মনের সেই অবস্থা থেকে কিছু একটা নিষ্কৃতির পথ খুঁজবার ভীষণ দরকার ছিল আমার। নিজের মধ্যে লজ্জা, হীনতা, ভীরুতার চতুর দ্বন্দ্ব আর যেন আমি বসে বসে দেখতে পারছিলাম না। আমার কেবলই মনে হত, যে ছানুর জন্যে আমার রক্তে অত আকুলতা অনুভব করতাম, সেই ছানুকে আমি টিবি-র ভয়ে ঘেন্না করতে শুরু করলাম কেমন করে। খুনীকে মানুষ যেমন ভয় পায়, ঘেন্না করে, এড়িয়ে চলে, ছানুর সম্পর্কে আমার মনোভাবটা যেন তেমনি হয়ে রইল। এ পৃথিবীতে এত আলো, এত বন, এমন নীল আকাশ, যৌবন, কাম, এ সবকিছু অর্থহীন হয়ে যাবে টিবি যদি তার বীভৎস হাত দিয়ে আমাকে ছোঁয়, ছানু জীবন নয়, আনন্দ নয়, ছানু সেই মৃত্যুর কালো ছায়া দিয়ে আমার জীবনকে ঢেকে দিতে চায়, এই কথা মনে হত আমার। ছানুর মা-বাবার চেহারা আমার মনে পড়ত আর আমি আঁতকে উঠতাম।

যাইহোক, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ খুঁজতেই বোধহয় আমি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লাম। ওখানে শ্রমিক বস্তিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন দুজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যুবক, আমারই সমবয়সী। তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আর আমার নির্জন কোয়ার্টারটা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের একটা অফিস হয়ে উঠল যেন। শ্রমিকদের দুঃখ, দুর্দশা, উপবাস, রোগ, অশিক্ষা আমি প্রতিদিন দেখতাম, (আমার এই নতুন কাজটাই ছিল শ্রমিকদের নিয়ে।) তাতে আমার সেই তরুণ বয়সে মালিকের উপর আমার রাগ হত। সেই রাগের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল শ্রমিক-লীডার ঐ দুই তরুণ। তাঁরা ভবিষ্যৎ গোছাবার চেষ্টা না করে দেশের মানুষের দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-

করবার সময় নিয়ে অতদূরে গিয়ে কত কষ্টে কাটাতেন। আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলাম। দিন-রাত শ্রমিক-বস্তিতে ঘুরতে লাগলাম তাঁদের সঙ্গে, রাতের পর রাত বস্তিতে গোপন বৈঠকে অংশ নিতে লাগলাম।

অবশেষে শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করল। দুজন নেতার মধ্যে একজন এ্যারেষ্ট হলেন, রাত্রে আমার কোয়ার্টার্সে এসে পুলিশ আমাকেও ধরল। চাকরিটি খতম হল। নাগপুর জেলখানায় আণ্ডার-ট্রায়েল-প্রিজ্‌নার হিসেবে কয়েদী হয়ে থাকলাম।

নাগপুর জেলে একটা ছোটো ঘরে আমাকে একা রাখা হয়েছিল, প্রায় মাসখানেক সেখানে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমি তখন নিজেকে শুধু জিজ্ঞেস করতাম, ছায়া সম্পর্কে আমার মনোভাব এমন হল কেন? যার জন্যে আমি জীবনও দিতে পারতাম, জীবনের ভয়ে তাকেই আমি ভয় করতে শুরু করলাম কেন!

আসলে কি ব্যাপার জানেন, আমারও 'রাজরোগ' আছে। রাজরোগ মানে টিবি। কিন্তু রাজরোগ সমাস ভাঙলে হবে রাজার রোগ, নয়তো রোগের রাজা। রাজার রোগ, কেননা এ রোগ হলে অনেক ভোগ দিতে হয়, অনেক সুখাদ্য যোগাতে হয়, দীর্ঘ বিশ্রাম এবং চিকিৎসার দরকার হয়, এ রোগে মানুষকে রাজার মতো রাখতে হয়, রাজার পক্ষেই এ রোগ শোভা পায়, তাই রাজরোগ নাম।

আর রোগের রাজা কেননা এ রোগ দুরারোগ্য, মৃত্যুর সমন নিয়ে আসে এ রোগ। তা রাজার রোগ আমার হয় নি, কিন্তু রোগের রাজা ছিল আমার চরিত্রে। সে রোগ হচ্ছে ভীরুতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, অন্যের সম্পর্কে উদাসীনতা। এইসব চারিত্রিক রোগ মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে, মানুষের হৃদয়কে পচিয়ে দেয়, তাই এদের আমি রোগের রাজা বলতে পারি। আর এ রাজরোগ হচ্ছে চরিত্রের রোগ, কিন্তু টিবি শুধুমাত্র শরীরের ব্যাধি, সে হচ্ছে শরীরের রাজরোগ।

একটু থেমে মৃন্ময়বাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, আমি আসলে ছায়াকে ভালবাসি নি, ছায়াকে দেখে আমার নতুন যৌবনের মন মোহগ্রস্ত হয়েছিল, আমাকে মত্ততা পেয়ে বসেছিল। কেন একথা বলছি? আমার চরিত্রে রাজরোগ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রেম কি চরিত্রের স্বভাবের রাজ-

রোগকেও সারিয়ে দিতে পারে না? আসলে কি জানেন, প্রেম করবার মতো যোগ্যতা, মানে খাঁটি মনুষ্যত্ব কিংবা স্বভাবরাজা মন সকলের থাকে না। বহু জন্মের পুণ্যেই তবে সে পরিশুদ্ধ মন লাভ করা যায়, যে মনের সমুদ্র-ঝিনুক প্রেমের মুক্তা ধারণ করতে পারে, সে মন আমার ছিল না। আমি মেয়েদের সম্পর্কে শুধুই মোহগ্রস্ত কামুক হতে পারি, দেহের সীমানা ছাড়িয়ে আত্মিক সৌন্দর্যে উঠবার মতো মন আমার নয়।

মৃন্ময়বাবু আমাকে সিগারেট দিয়ে নিজেও সিগারেট ধরালেন। ততক্ষণে সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছে। দীঘির জলে রাঙা ভাঙ্গা চাঁদ দুলছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট টেনে আচ্ছন্নভাবে মৃন্ময়বাবু বললেন, কাহিনী আমার এইখানেই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আর একটু না বললে আপনি ছানুকে বুঝতে পারবেন না।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি কলকাতা ফিরে এলাম। যাকে বলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। নানান জায়গায় দরখাস্ত করা ছিল। হঠাৎ সরকারী চাকরি জুটে গেল। আমার মধ্যপ্রদেশের কীর্তিকলাপ বাংলা সরকারের কানে ওঠে নি। আর চাকরি হতেই বাড়ির লোকে ধরে করে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল, পাছে আমি ছানুকে বিয়ে করে বসি।

বাঘের ছানা রক্তের স্বাদে ভুলে গেল। শরীর এমন জিনিস। শরীরের লজ্জা নাই, ঘেন্না নাই, অনুতাপ নাই। রক্তের লালসার দাস আমরা কিংবা আমার মতো মানুষ। বউকে ভালোবাসলাম না, অথচ তার শরীরটাতে আমার প্রয়োজন থাকল।

বিয়ের বছর দুই পরে কদিনের ছুটিতে বৌকে নিয়ে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আমার একটি ছেলেও হয়েছে। সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে উঠেছি। পুরীতে থেকে দর্শনীয় সবই দেখা হয়ে গেছে। তবুও আরও কটা দিন থাকবার ইচ্ছে। বিকেলে সমুদ্রের ধারে বৌকে নিয়ে বসেছিলাম। তারপর ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হবে বলে স্ত্রী হোটেলে চলে গেলেন। আমি সমুদ্রের বালিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে বিশাল উন্মত্ত সমুদ্রের সেই উদ্দাম ভয়ঙ্কর দাপাদাপি দেখছিলাম। সমুদ্রের সঙ্গে আমার নিজের তুলনা করা অপরাধ। তবু মনে হচ্ছিল ঐ সমুদ্রের এক টুকরো যেন আমার বুকের মধ্যেও আছে। চারদিকে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে, বসে আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল খানিক দূরে যেন অবিনাশদা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছেন।

আমি কেঁপে উঠলাম, ভয়ে অস্বস্তিতে আনন্দে কি এক রকম অনুভূতি আমাকে কাতর করে তুলল। অবিনাশদাকে দেখাচ্ছিল দগ্ধ জলন্ত অঙ্গারময় দীর্ঘ কোনো বৃক্ষের মতো। বিকেলের ম্লান আলোয় সমুদ্র ও আকাশের প্রেক্ষাপটে তাঁকে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মতো মনে হচ্ছিল। আমার পা কাঁপছিল তবু দ্রুত হেঁটে আমি অবিনাশদার সামনে গিয়ে নিচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। অবিনাশদা চমকে উঠলেন, দারুণ অবাক হলেন, তারপর চিনতে পেরে বললেন, মৃন্ময়, তুমি!

বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

অবিনাশদা স্বভাবতঃ সংযত চরিত্রের মানুষ, আমি তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বাস কখনো দেখি নি, তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান স্থিতধী তা আমি জানতাম। তবু তাঁর মধ্যে সেই মুহূর্তে হঠাৎ এক প্রচণ্ড আবেগের প্রকাশ আমি দেখেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলেন, ভালো আছ মৃন্ময়?

আমি বললাম, ভালোমন্দ বুঝতে পারি না অবিনাশদা।

তারপর শুধোলাম, আপনি কেমন আছেন অবিনাশদা?

উনি বললেন, আমি কিছুদিন পুরীতে আছি। ডাক্তারের পরামর্শেই আসতে হয়েছে। আমার শরীর তেমন ভালো নয়, মৃন্ময়।

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন, তোমাকে এতদিন পরে দেখে বড় আনন্দ হল, তোমার তাড়া নেই তো, চলো একটু বেড়াই দুজনে।

সমুদ্রের সেই বিস্তৃত বালির উপর দিয়ে দুজনে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলাম। আমরা কোনো কথা বলছিলাম না। কিন্তু যেন অনুচ্চারিত কথার আদান-প্রদান চলছিল দুজনের মধ্যে। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, অবিনাশদার মধ্যে কোনো ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখ যেন নেই। যেন তিনি এক গভীর বেদনায় বৈরাগ্যে ডুবে আছেন। আমরা হেঁটে হেঁটে বি.এন.আর হোটেলের দিকে ঝাউবনের কাছাকাছি চলে গেলাম। তারপর আবার ফিরতে শুরু করলাম। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সমুদ্রের দুরন্ত হাওয়ায় ঝাউগাছের কাতর বিলাপ সমুদ্র-গর্জনের সঙ্গে মিশে গেছে। সমুদ্র যেন রাত্রিতে আরও দুরন্ত আরও অস্থির হয়ে ওঠে। অন্ধকার আকাশের নীচে সমুদ্র ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় ফসফরাসের দীর্ঘ সর্পিল চঞ্চল রেখা ঝকঝকে তলো-

রাবের মতো দীপ্ত হয়ে উঠেছে। যেন অসংখ্য সুদীর্ঘ শানিত তলোয়ারের বিরামহীন যুদ্ধ চলেছে, যেন দ্রুত ধাবমান বহু আলোকিত ট্রেন পরস্পরের সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ছে। রাত্রির নির্জন অন্ধকার সমুদ্রের প্রমত্ত গর্জনে, হাহাকারে শিউরে উঠছিল।

অবিনাশদা অত্যন্ত স্নেহ, ব্যগ্রতা এবং আকুলতার সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার আর আমাদের পরিবারের সকলের খোঁজ খবর নিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, অবিনাশদা, আপনি সেই মধ্যপ্রদেশেই আছেন?

অবিনাশদা বললেন, না, অনেকদিন হল ওখান থেকে চলে এসেছি। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা খুব ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতা নিয়ে এলাম। বাবারও টিবি হয়েছিল। আমিও কিছুদিন পরে আমাদের কোম্পানীর কলকাতা অফিসে ট্রানস্‌ফার হয়ে সবাইকে নিয়ে কলকাতা চলে এলাম। মা'র ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি বলে কলকাতায় বড় বড় ডাক্তারের কাছে বাবাকে দেখালাম। কিন্তু বাবা মায়ের শোক সহ্য করতে পারছিলেন না, তিনিও চলে গেলেন।

—আপনি?

বলে আমি চুপ করে গেলাম।

উনি বললেন, না আমি বিয়ে করিনি। শান্তি প্রীতির বিয়ে দিয়েছি। ওরা একরকম ভালোই আছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, মাঝখানে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা বললেন, আমার টিবি নয়, তবু একটু হাওয়া বদলাতে বললেন, আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বড় ক্লান্তি বোধ করতাম, ভাবলাম যাই দিন কতক ঘুরে আসি।

আবার তিনি নীরব হলেন। আবার সেই গর্জমান আলোর-মুকুট-পরা সহস্র-শীর্ষ সমুদ্রের কূলে আমরা নিঃশব্দে হেঁটে চললাম। সমুদ্রের দাপাদাপি, হাহাকার আর ফেনোচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়তটেই যেন আছড়ে পড়তে লাগল।

হোটেলগুলোর কাছাকাছি এসে আর আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না, কেননা এবার আমাদের পরস্পরের কাছে বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। আর অন্ধকারে যদিও সমুদ্রের আদিগন্ত দীপ্তির বিচ্ছুরিত জ্যোতি ছড়ানো ছিল তবু আমরা পরস্পরের মুখ আর স্পষ্ট করে

দেখতে পাচ্ছিলাম না। অন্ধকার তার আবরণে আমার লজ্জাকে ঢেকে দিয়েছিল।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, অবিনাশদা, ছানু কোথায়. কেমন আছে?

অবিনাশদা অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। তারপর ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন, এত সন্তর্পণে যেন গভীর পবিত্র ও সুকুমার কোনো সামগ্রীকে তিনি সাবধানে অনিচ্ছায় দেখাতে বাধ্য হচ্ছেন, যেন কম্পমান ক্ষীণ ম্লান চাঁপার কলির মতো কোনো প্রদীপশিখাকে তিনি দুহাতে আড়াল করে রক্ষা করতে চাইছেন, ছানু! মায়ের পর মৃত্যুর ছানু যেন কেমন হয়ে গেল মৃন্ময়। তুমি তো দেখেছিলে, কত জীবনময়ী ছিল সে। আমাদের অত দুঃখের মধ্যে, রোগ দুশ্চিন্তার মধ্যে, শ্বাসবন্ধ অন্ধকারের মধ্যেও ছানু ছিল আনন্দের মতো। কিন্তু ছানুর আনন্দ মরে গেল। ছানু ভালো গান গাইত। গান আগেই বন্ধ করেছিল, পরে কথাও বন্ধ করল। তুমি শুনলে অবাক হবে, ছানু উদয়াস্ত খেটে যেত, আমাদের অত বড় সংসারের সব কাজ করত, কিন্তু কথা বলত না, হাসত না, হাসতেও ভুলে গিয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, কলকাতা ফিরে আসার পর বাবার মৃত্যু হল। তারপর আমি ছানুর বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ছানু একদিন বলল, দাদা, আমার বিয়ে করবার মন নেই। আমি ছানুকে কত বোঝালাম। কিন্তু ছানুর মধ্যে কি রকম যে এক ব্যক্তিত্ব ছিল! বুঝলাম, ছানু মনস্থির করে ফেলেছে, এ সাধারণ কোনো হালকা খেয়ালের ব্যাপার নয়। তারপর অনেক দেখে শুনে—আমার কর্তব্য বলো, আমার আকাঙ্ক্ষা বলো, আমার মা-বাবা হারা বোনরা তো আমার নয়নের মণি, আমার সব, তা জামাই দুটি ভালোই হয়েছে, শান্তি প্রীতিও ভালোই আছে, ওদের স্বাস্থ্য ভালো, আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন কিন্তু ছানুর যে কি হল! ও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগল, ছানুর অমন স্বাস্থ্য সলতের মতো হয়ে গেল। আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, বড় বড় ডাক্তার, ওর কোনো শারীরিক রোগ ছিল না। শেষে বললাম, চল কলকাতা ছেড়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাই, তাও যেতে চাইল না। শেষে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বিছানা ছেড়ে আর যেন উঠতেও পারত না। তারপর আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দর ছিল, ভালো ছিল, সেই, সেই ছানু একদিন

সন্ধেবেলা আমার চোখের সামনে মারা গেল। মৃত্যুর সময় ছান্নুর সরু শীর্ণ হাতখানি আমার হাতে ধরা ছিল।

অবিনাশদার কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল। তিনি একেবারে চুপ করে গেলেন। আরও কিছুক্ষণ দুজনে পাশাপাশি হাঁটলাম।

আচমকা অবিনাশদা বললেন, মৃন্ময়, কতদূর আসবে, রাত্রি হয়েছে।

বুঝলাম আর তিনি আমাকে সঙ্গে রাখতে চাইছেন না। আমি আবার নত হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

উনি অস্ফুটস্বরে বললেন, ভালো থাকো।

আমার কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু চাপড় দিলেন, বললেন, চলি ভাই!

তারপর ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বালির উপর দিয়ে চলে গেলেন। খানিক পরে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন তিনি।

ধাত্রী পান্না

ওরা থিয়েটার করছে। পাড়ার কিশোরী মেয়েরা। বিকেলে, বাড়ির উঠোনে। শাড়ী দিয়ে তৈরী ছোটো স্টেজ। দর্শক পাড়ার মেয়েরা আর ছেলেরা। নাটক ছোটো 'ধাত্রী পান্না'। জুঁই নায়িকা। আমাকে ওরা প্রম্‌টার হতে বলেছে। জুঁই আমারও নায়িকা। তখন যৌবনের সন্ধিলগ্নে আমি। টালমাটাল দশা।

উইংসের আড়ালে ছোটো টুলে বই হাতে আমি। পর্দা উঠল। জুঁই স্টেজে এল। আমার সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত অন্তরাত্মা জুঁইয়ের দিকে। জুঁই ছোয়ালো ছোয়ালো একহারা মেয়ে, পশ্চিমা মেয়েদের মতো শাড়ি পড়েছে আজ। টানা টানা চোখে কাজলের মর্ম-বিদারী লীলায়িত টান, নাকে নাকছাবি, ঠোঁটে আজ ও প্রথম রঙ মেখেছে। ছোট্ট স্টেজ, জুঁই আমার কাছ থেকে নড়ছে না। ও পাঠ গুলিয়ে ফেলছে, আমি জুঁইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওর পাঠ ধরিয়ে দিচ্ছি। আর রোমাঞ্চিত শিহরিত হচ্ছি।

অভিনয় শেষ হলে সন্ধেবেলায় দুজনের প্রিয় সেই মহুয়া গাছটির নীচে আমার প্রতিদিনের বরাদ্দ দর্শনলাভ ঘটল। ও আস্তে করে হাসল, অত সুন্দর দাঁত আমি কখনও দেখি নি। ওর হাসি যেন আকাশে বাতাসে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে যায়।

কতদিন পরে ওর কান্না, আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিয়ের দিন ঠিক হল ওর।

ও আমারই সামনে চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদল, বলল, মা-বাবার সম্মান আমার ভালোবাসার চেয়ে বড়; জানি, সারাটা জীবন আমার অঙ্গার হয়ে যাবে...

আমার মনে পড়ল, ধাত্রী পান্না নিজের সন্তানকে ঘাতকের ছুরির মুখে আগিয়ে দিয়ে রাজভক্তিকে বড় করেছিল।